ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন

কেন ?

গত বছরের জুন মাসে কেন্দ্রীয় সরকার যে কৃষি অর্ডিন্যান্স জারি করে তার পর থেকে এক বছরের বেশি সময় ধরে একটানা কৃষক আন্দোলন চলছে। গত নভেম্বর মাস থেকে প্রায় সাত মাস ধরে রাজধানী দিল্লির তিনটি প্রান্তে কৃষক ও খেতমজুররা অবস্থান-বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের দাবি হল: গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে লোকসভায় বিজেপি সাংসদদের সংখ্যার জোরে এবং রাজ্যসভায় ধ্বনিভোট, অর্থাৎ গলার জোরে যে তিনটি কৃষি বিল পাশ করানো হয়েছে, তার সম্পূর্ণ প্রত্যাহার।

এই তিনটি কৃষি বিল প্রকৃত অর্থে দানবীয়। প্রথম বিলটি হল, চাষিদের থেকে কৃষিজ পণ্য ক্রয় করার জন্য সরকার নির্ধারিত যে বাজার বা মান্ডি ব্যবস্থা আছে, তাকে তুলে দেওয়া। এর মাধ্যমে কৃষকদের ভারতের যে কোনও প্রান্তে এবং বিশ্ব-বাজারে ব্যবসায়ী এবং দেশী-বিদেশী কোম্পানিকে কৃষিজ পণ্য বেচার 'অবাধ স্বাধীনতা' দেওয়া। এছাড়া, কৃষকদের থেকে সরকারের নির্ধারিত ন্যূনতম সহায়ক দামে (Minimum Support Price বা MSP) ফসল ক্রয়ের যে ব্যবস্থা আছে সে ব্যাপারে কোনও আইন প্রয়োগে বিরত থেকে ঐ ব্যবস্থাকে তুলে দেওয়ার রাস্তা পরিষ্কার করা এবং রেশন ব্যবস্থাকে ব্যাপক মাত্রায় সঙ্কুচিত করার পরিকল্পনাও আছে। দ্বিতীয় বিলটি হল, নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের মজুতের বিরুদ্ধে যে আইন আছে—যার মাধ্যমে খাদ্যদ্রব্যের দাম নিয়ন্ত্রিত রাখার রীতি প্রচলিত—সেই আইনটাকে তুলে দিয়ে মুক্ত বাজারের নিয়মে দাম নির্ধারণের ব্যবস্থা করে দেওয়া। তৃতীয় বিলটিতে আছে: বড় বড় কোম্পানির সঙ্গে চাষিদের চুক্তিচাষের ব্যবস্থা করে দেওয়া। এছাড়া, নয়া বিদ্যুৎ বিলের মাধ্যমে যেভাবে বিদ্যুতের দাম ব্যাপক বৃদ্ধি করার চক্রান্ত করা হয়েছে, তার বিরুদ্ধেও চাষিদের আন্দোলন পরিচালিত।

চাষিরা, যারা দিল্লির উপকণ্ঠে প্রায় সাত মাস ধরে বিক্ষোভ চালাচ্ছে, তারা সজোরে ঘোষণা করেছে, এই বিল বা আইনগুলি চাষিদের কাছে সর্বনাশা। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার প্রকৃতপক্ষে ভারতের কৃষিব্যবস্থাকে দেশী-বিদেশী বড় ব্যবসায়ী তথা বহুজাতিক কর্পোরেশনের হাতে তুলে দিচ্ছে। গ্রাম ও শহরের গরিব মেহনতী মানুষ যে রেশন ব্যবস্থার অস্তিত্বের ফলে কোনও ক্রমে বেঁচেবর্তে আছে তাদেরকে এক ভয়াবহ অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। এমনকি চাষিদের হাতে যে জমি আছে ক্রমে ক্রমে তা বড় বড় দেশী-বিদেশী কর্পোরেটদের হাতে চলে যাবে এমন আশঙ্কাও চাষিদের মধ্যে ঘনীভূত হয়েছে। দিল্লিতে অবস্থানের আগে কয়েক মাস ধরে তারা পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান সহ নানা প্রদেশে তীব্র বিক্ষোভ দেখিয়েছে। কিন্তু তাতে সরকার বিন্দুমাত্র টলেনি। অবশেষে চাষিরা লাখে লাখে জড়ো হয়েছে দিল্লির সীমান্তে। প্রকৃতপক্ষে, 'স্বাধীন' ভারতে এত বিশাল মাপের কোনও বিদ্রোহ দেখা গেছে কি না সন্দেহ। আন্দোলনরত চাষি ও খেতমজুরদের একাংশ ক্লান্ত হয়ে গ্রামে ফিরে গেলে তার জায়গা নিয়েছে আরও হাজার হাজার চাষি ও মজুর। ইতিমধ্যে ৪৭০ জন চাষি মারা গেছে। প্রবল ঠান্ডা, বৃষ্টি, তাপপ্রবাহ, করোনা-ভীতিকে মোকাবিলা করে জোয়ান-প্রৌঢ়-বৃদ্ধ, পুরুষ ও নারীদের যোগদানে গড়ে ওঠা এই প্রকাণ্ড আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে এক ঐতিহাসিক সংগ্রাম হয়ে উঠেছে।

কেন্দ্রীয় সরকার বেশ কয়েকবার আন্দোলনরত চাষিদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়েছে এবং রকমারি প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাসবাক্য বর্ষণ করেছে। সরকার চেয়েছিল এইসব টুকরো প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে চাষিদের নেতৃত্বকে কিনে নেওয়া এবং আন্দোলনে ফাটল ধরানো। কিন্তু সরকারের এই চক্রান্ত ব্যর্থ। অনুনয়-বিনয়ে কাজ না হওয়ায় বিজেপি সরকার গরম দেখানোর রাস্তাও নিয়েছে। বিক্ষোভস্থলকে কাঁটাতার বসিয়ে, গজাল পুঁতে ও পরিখা কেটে প্রায় যুদ্ধক্ষেত্রে

পরিণত করেছে। হাজারে হাজারে আধা-সামরিক সেনা ও বিরাট পুলিশবাহিনীকে নামানো হয়েছে বিদ্রোহী চাষিদের মোকাবিলায়। চাষিদের প্ররোচিত করার জন্য ফ্যাসিবাদী সঙ্ঘ পরিবারের বাহিনীকে নামানো হয়েছে। চাষিদের বিভ্রান্ত করার জন্য চাষিদের মধ্যে নিজেদের দালাল ঢুকিয়ে দিতেও সরকার দ্বিধা করেনি। এতদ্‌সত্ত্বেও সংগ্রামী চাষিরা অনড় অটল হয়ে দাবি করেছে—কোনও সিকি বা আধা প্রতিশ্রুতি নয়—তিনটি আইনকে পুরোপুরি প্রত্যাহার করতে হবে। নচেত অবস্থান-অবরোধ ও বিক্ষোভ জারি থাকবে। সরকার যতই অনমনীয় হয়েছে, গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে আরও হাজারে হাজারে চাষি ও তাদের পরিবার এসে আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছে। দিল্লি সীমান্তে চাষিরা প্রকৃতই এক ইতিহাস রচনা করেছে।

চাষিদের এই সংগ্রাম ঐতিহাসিক কেননা তারা শুধু সরকারের পদক্ষেপের বিরুদ্ধে লড়াই করছে না। চাষিরা তাদের অভিজ্ঞতা এবং বিচার-বিশ্লেষণী ক্ষমতা দিয়ে উপলব্ধি করেছে যে কৃষি আইনগুলি শুধু তাদের ধ্বংসের রাস্তাই তৈরি করছে না, অন্যদিকে এগুলি দেশী-বিদেশী বৃহদাকার কর্পোরেটদের হাতে লুঠের জন্য ভারতের কৃষি ব্যবস্থাকে তুলে দিচ্ছে। অর্থাৎ, চাষিদের এই সংগ্রাম অন্তর্বস্তুতে সাম্রাজ্যবাদী ভুবনীকরণ ও উদারীকরণের বিরুদ্ধে এবং ভারতের বড় পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে এক সুতীব্র প্রতিরোধ। আরও নির্দিষ্ট করে বললে, চাষিদের এই সংগ্রাম দেশের ব্যাপক গরিব মেহনতী মানুষের হাতে থাকা জীবনধারণের ন্যূনতম উপায়গুলি কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে সোচ্চার এক বিদ্রোহ। তাদের এই লড়াই তাই শুধু কৃষকদের নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থেই পরিচালিত নয়, তা তামাম মেহনতী মানুষের কাছে দেশী-বিদেশী পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের এক বার্তা।

উল্লেখযোগ্য হল, চাষিরা যে অভূতপূর্ব সংগ্রাম গড়ে তুলেছে তার জন্য তারা কোনও সংসদীয় দলকে বা তাদের নেতানেত্রীকে ধরতে যায়নি। তারা এই লড়াই করছে বিভিন্ন সংসদীয় দলগুলিকে বাদ দিয়েই। সংগ্রামের মঞ্চে তারা কোনও সুবিধাবাদী সংসদীয় দলকে ভিড়তে দেয়নি। এত বড় লড়াই, কোনও প্রতিষ্ঠিত পার্টি ছাড়া কৃষকরা জারি রেখেছে প্রায় সাত মাস ধরে। আশা করি এই সংগ্রাম ভারতের ব্যাপক গরিব মেহনতী মানুষ, বিশেষত শ্রেণিসংগ্রামের ময়দানে অনুপস্থিত শ্রমিকদের উজ্জীবিত করবে।

আমরা এই পুস্তিকায় এই প্রতিরোধ-সংগ্রামের ভিতরকার তাৎপর্যকে বিশ্লেষণ করব। আমরা দেখব, ভারতের কৃষি ও খাদ্যব্যবস্থাকে দখলে আনার জন্য এবং অতি মুনাফা লুঠের জন্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি সহ ভারতের পুঁজিপতিরা কী ভয়ঙ্কর এক চক্রান্তে লিপ্ত। আমরা দেখব, তিনটি কৃষি আইন রচিত হয়েছে ভারতের কৃষি ও খাদ্যব্যবস্থাকে সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনের সামনে উন্মুক্ত করে দেবার জন্য।

কৃষি আইনগুলি কাদের স্বার্থে রচিত?

গত বছরের এপ্রিল মাসে, ভারত সরকারের ভূতপূর্ব উপদেষ্টা ও উদারনীতির অন্যতম উপাসক অরবিন্দ পানাগরিয়া কোভিড-১৯ সংক্রমণের ফলে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণের জন্য ভারত সরকারকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন, ''এই সংকটকে বৃথা হতে দেবেন না। এই সংকট... সরকারের কাছে জমি ও শ্রম বাজারে সংস্কার করার সুযোগ এনে দিয়েছে যা শান্তিপূর্ণ সময়ে করা কঠিনতর''।[১] পানাগরিয়ার উপদেশ-বার্তা আসার দু'মাসের মধ্যে জুন মাসে সরকার কৃষি অর্ডিন্যান্স জারি করে। নীতি আয়োগের প্রধান অমিতাভ কান্ত সানন্দে বলে ওঠেন, এই বিল ভারতীয় কৃষিতে এক গুরুত্বপূর্ণ মোড় ঘুরিয়ে দিল। কৃষি বিশেষজ্ঞ এবং নীতি আয়োগের সদস্য অশোক গুলাটি অবশ্য তার আগেই বলে ফেলেন, 'মনে হচ্ছে আমরা ১৯৯১-এ উদারনীতি চালু করার মুহূর্তে পৌঁছে গিয়েছি'।[২] বস্তুত, ১৯৯১ সালে সাম্রাজ্যবাদী সংস্থা বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও আইএমএফ-এর প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ভারতীয় অর্থনীতিতে যে কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস ও উদারনীতি চালু করা হয়েছিল সাম্প্রতিক কৃষি আইন তাকে

অনুসরণ করে এসেছে।

কৃষি আইনসমূহ যে দেশী ও আন্তর্জাতিক বহুজাতিক কর্পোরেশনের স্বার্থে রচনা করা হয়েছে তা স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীও পরিষ্কার করে দিয়েছেন। গত বছরের জুন মাসে কৃষি অর্ডিন্যান্স জারি করার এক মাসের মধ্যে ইউএস-ইন্ডিয়া বিজনেস কাউন্সিল আয়োজিত 'ইন্ডিয়া আইডিয়াজ সামিট' সভায় নরেন্দ্র মোদী মার্কিন বিনিয়োগকারীদের উদ্দেশে বলেন:

> ভারত সম্প্রতি কৃষি ক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক সংস্কার করেছে। [এর ফলে] কৃষি উপকরণ ও যন্ত্রপাতি, কৃষি সরবরাহ শৃঙ্খল পরিচালনা, প্রস্তুত করা খাদ্য, মৎস্য ক্ষেত্র এবং জৈব উৎপাদনে বিনিয়োগের সম্ভাবনা খুলে গেছে। ২০২৫ সালে ভারতের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্রের আয়তন দাঁড়াবে ৫০,০০০ কোটি ডলার। আরও বেশি লাভ করতে হলে ভারতীয় কৃষি ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সুযোগের সদ্ব্যবহার করার এটাই হল আসল মুহূর্ত।[৩]

কৃষি ক্ষেত্রে ভারতের সরকার যে এক 'ঐতিহাসিক' সংস্কার করেছে সে ব্যাপারে নরেন্দ্র মোদী অত্যন্ত স্পষ্টবক্তা। প্রকৃতপক্ষে কৃষি আইন জারি করার পর আন্তর্জাতিক পুঁজি এবং তাদের দোসর দেশীয় বড় পুঁজির প্রতিনিধিরা তুমুল উল্লাস প্রকাশ করেছে। দিল্লিতে কৃষক আন্দোলন শুরু হওয়ার দেড় মাসের মাথায় আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার (আইএমএফ)-এর এক ডিরেক্টর গেরি রাইস বলেন, ভারত সরকারের এই সংস্কার চাষিদের ফসল বিক্রেতাদের কাছে সরাসরি পৌঁছে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে।[৪] ইউএস-ইন্ডিয়া স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ ফোরাম-এর সভাপতি মুকেশ আঘি সানন্দে ঘোষণা করেছেন, এই সংস্কারের ফলে ভারতের কৃষকরা সরাসরি আমাজন ও ওয়ালমার্টের কাছে পৌঁছে যাবে এবং বিশ্ব সরবরাহ শৃঙ্খলের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে।[৫] ফেব্রুয়ারি মাসের ৪ তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার ভারতের কৃষি আইনকে দুই হাত তুলে সমর্থন দিয়েছে এবং ঘোষণা করেছে যে এর ফলে ভারতীয় বাজারের ''দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে''।[৬]

১৯৮০-এর দশকের শেষভাগে ভারতের অর্থনীতিতে উদারীকরণ নীতি গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এর পিছনে যেমন সাম্রাজ্যবাদী সংস্থা বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও আইএমএফ-এর চাপ ছিল, তেমনই ভারতীয় বুর্জোয়া শিবির আন্তরিকভাবে এই উদারনীতি গ্রহণ করেছিল। বস্তুত, 'স্বাধীনতা'র পর ভারতে যে পুঁজিবাদী বিকাশ ঘটেছিল, তার পিছনে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের বড় ভূমিকা ছিল। বিভিন্ন ভারী শিল্প সহ পরিকাঠামোর বিকাশে পুঁজি ঢালার কাজটা করেছিল রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রগুলি। এই ভূমিকা গ্রহণের ফলে দেশে বড় পুঁজিপতিদের ক্ষমতা ও সাধ্য বৃদ্ধি পায়। তারা আরও বড় হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় 'স্বাধীনতা'-পরবর্তী নীতিতে পরিবর্তনের জন্য জোরালো সওয়াল করতে থাকে। একই সাথে গভীর ঋণগ্রস্ত ভারতের উপর বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও আইএমএফ থেকে চাপ বাড়তে থাকে অর্থনীতিতে কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস ও উদারীকরণের জন্য। লক্ষণীয় হল, তখন থেকেই বিশ্ব ব্যাঙ্ক ভারতের উপর চাপ ফেলে কৃষি ক্ষেত্রে বড় মাপের সংস্কার করার জন্য।

বিশ্ব ব্যাঙ্ক: কৃষিক্ষেত্রে সংস্কারের নির্দেশাবলী

১৯৯১ সালের জুলাই মাসে কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করার আগে বিশ্ব ব্যাঙ্কের এক মেমোরান্ডাম (খণ্ড ১) প্রকাশিত হয় এবং তাতে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়,

> সুতরাং ভারতকে তার অর্থনীতিকে পুনর্বিন্যাস করার জন্য কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রকৃত বিকল্প হল, ভারত বৈদেশিক সাহায্য নিয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ, বৃদ্ধি-অভিমুখী পুনর্বিন্যাস কর্মসূচী গ্রহণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেবে না কি বহু বছরের জন্য আন্তর্জাতিক পুঁজির বাজার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দেশকে এক বিশৃঙ্খল ও যন্ত্রণাদায়ক প্রক্রিয়ার মধ্যে ফেলে দেবে এবং বৃদ্ধির পরিমাপ ব্যাপক মাত্রায় সঙ্কুচিত করবে।[৭]

বিশ্ব ব্যাঙ্কের এই মেমোরান্ডামে কৃষি সংস্কারের জন্য ভারত সরকারের প্রতি যে যে নির্দেশাবলী ঘোষিত হয় তার মধ্যে অন্যতম হল:

১) চার বছরের মধ্যে সারের উপর থেকে ভরতুকি তুলে দিতে হবে। ভারতের সার শিল্পে সরকার যে আর্থিক সহায়তা দেয় তার অবসান ঘটাতে হবে এবং দেশে সারের দামকে বিশ্ব বাজারে সারের দামের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

২) কৃষি ক্ষেত্রে সরকার উদার হস্তে যে ঋণ দেয় তা বন্ধ করে দিতে হবে।

৩) কৃষিতে সেচব্যবস্থা, পশুপালন ও অন্যান্য যে সব ক্ষেত্রে সরকারি সহায়তা প্রদান করা হয় তা বন্ধ করে দিতে হবে।

৪) কৃষি পণ্য আমদানি ও রপ্তানির উপর সমস্ত বিধি-নিষেধ তুলে দিতে হবে এবং তৈলবীজের আমদানি অবাধ করে দিতে হবে।

৫) বীজের গবেষণায় বেসরকারি উদ্যোগ, বেসরকারি বিনিয়োগের রাস্তা করে দিতে হবে।

৬) কৃষিক্ষেত্রে বিদ্যুতের উপর ভরতুকি তুলে দিয়ে বিদ্যুতের দাম বাড়াতে হবে।

৭) ফসল ক্রয়, পরিবহণ ও গুদামে সঞ্চয়ের উপর ফুড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়ার নিয়ন্ত্রণ ধাপে ধাপে তুলে দিয়ে সে দায়িত্ব লাইসেন্সপ্রাপ্ত এজেন্ট, পাইকারি বিক্রেতা ও মজুতদারদের হাতে তুলে দিতে হবে।

৮) আপৎকালীন সময়ের জন্য খাদ্যফসল মজুতের যে ব্যবস্থা প্রচলিত তা তুলে দিতে হবে এবং খাদ্য ফসলের ঘাটতি দেখা দিলে আন্তর্জাতিক খাদ্যফসল বাজারের উপর নির্ভর করতে হবে।

৯) কৃষকদের থেকে ন্যূনতম সহায়ক দামে খাদ্যফসল কিনে নেওয়ার নীতি প্রত্যাহার করতে হবে।

১০) খাদ্যে ভরতুকি কমিয়ে দিতে হবে এবং প্রকৃত গরিবদের জন্য গণবণ্টন ব্যবস্থা চালু রেখে বাকিদের বণ্টন ব্যবস্থা থেকে ছেঁটে ফেলতে হবে।[৮]

গত তিরিশ বছরে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্ব ব্যাঙ্কের উপরোক্ত নির্দেশাবলী নানা ভাবে প্রয়োগ করেছে। যেমন পটাশ ও ফসফেট সারের উপর ভরতুকি কমিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং দামের উপর নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া হয়েছে। ফলে কৃষিকার্যে প্রযুক্ত নাইট্রোজেন-ফসফরাস-পটাশ সারের মধ্যে ভারসাম্য বড় পরিমাণে বিঘ্নিত হয়েছে এবং জমির উর্বরতা নষ্ট হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ও সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে চাষিদের যে ঋণ দেওয়া হয় তাতে লাগাম পড়ানো হয়েছে। চাষিরা ব্যাপকভাবে মহাজন, ব্যবসাদার থেকে উঁচু সুদের হারে ঋণ নিতে বাধ্য হয়েছে। ১৯৯৫ সালের পর প্রায় তিন লক্ষ ঋণগ্রস্ত চাষি আত্মহত্যার মতো চরম পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে। কৃষিতে সরকারি সাহায্য ও বিনিয়োগ ব্যাপক পরিমাণে সঙ্কুচিত হয়েছে। বিদেশ থেকে কৃষিপণ্য আমদানির উপর বিধিনিষেধ বেশ কিছুটা তুলে নেওয়া হয়েছে। ভারত এখন তার প্রয়োজনীয় ভোজ্যতেলের অর্ধেক বিদেশ থেকে আমদানি করে। বীজের বাজার ও উন্নয়ন থেকে সরকার ক্রমশ হাত গুটিয়ে নিয়েছে এবং তা ক্রমে ক্রমে বেসরকারি হাতে চলে যাচ্ছে। ২০২০ সালের বিদ্যুৎ বিলে সমস্ত ভরতুকি এক ধাক্কায় তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত পাকা করা হয়েছে। ১৯৯৭ সালে গণবণ্টন ব্যবস্থা সঙ্কুচিত করে বিপিএল ও এপিএল ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এপিএল অংশের জন্য খাদ্যের দাম এতটাই বাড়ানো হয়েছে যে গণবণ্টন ব্যবস্থা থেকে ব্যাপক ভারতবাসী বাদ পড়ে গেছে।

অর্থাৎ, গত তিরিশ বছরে বিভিন্ন সরকার বিশ্ব ব্যাঙ্কের নির্দেশিকা পালনের পথে বেশ কিছু দূর এগিয়ে গিয়েছে। অন্যান্য সরকার যে কাজটা ধীরে ধীরে ও রেখে ঢেকে করছিল এবং সাম্রাজ্যবাদী নির্দেশিকার মধ্যে যে সংস্কারগুলি

বকেয়া ছিল বর্তমান সরকার তা এক ধাক্কায় করেছে। তাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে এক কৃষি মহাসম্মেলনে ঘোষণা করেন:

> আমরা যে কাজ করেছি তা ২৫-৩০ বছর আগে করা উচিত ছিল।... এই কৃষি সংস্কার রাতারাতি হয়নি। এই দেশের প্রতিটি সরকার গত ২০-২২ বছর ধরে রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে এ ব্যাপারে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা চালিয়েছে।[৯]

মোদী ভুল বলেননি। যে কাজটা ধীরে ধীরে ও ক্রমে ক্রমে চলছিল তাকে তিনটি কৃষি আইনের মাধ্যমে এক সামগ্রিক কৃষি সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত করা হল।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা কী চেয়েছে?

১৯৪৮ সালে বিশ্ব বাণিজ্যের উপর সাম্রাজ্যবাদী তথা উন্নত ধনী দেশগুলির নিয়ন্ত্রণ কায়েমের উদ্দেশ্যে গঠিত হয় জেনারেল এগ্রিমেন্ট অব টারিফস্ অ্যান্ড ট্রেড (গ্যাট)। নানা পণ্যসামগ্রীর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, আমদানি ও রপ্তানির উপর গ্যাটের নিয়ন্ত্রণ ও শর্তাবলী চাপানো হলেও ভুবনীকরণের পর্যায়ে, তা যথেষ্ট বলে বিবেচিত হল না। পণ্যসামগ্রী উৎপাদন, আমদানি ও রপ্তানির উপর সাম্রাজ্যবাদী কব্জা আরও শক্তপোক্ত করার জন্য ১৯৯৫ সালে গঠিত হল বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডবল্যুটিও)। লক্ষণীয় হল, আগে কৃষিক্ষেত্রকে গ্যাটের মধ্যে ধরা হত না। ১৯৯০-এর দশকে সেই কৃষিক্ষেত্রকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অধীনে নিয়ে এসে তার উপর সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির নিয়ন্ত্রণ কায়েমের নিরন্তর প্রচেষ্টা শুরু হল।

প্রথম থেকেই বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার লক্ষ্যবস্তু ছিল ভারত সহ অন্যান্য উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলির কৃষি। ভারত একটি বিপুল জনবহুল দেশ এবং তার কৃষিক্ষেত্রের আয়তন তথা বাজারও বিশাল। ১৯৯০-এর দশকে উদারনীতি চালু হওয়ার আগে থেকে ভারতীয় কৃষিতে যে ব্যবস্থাবলী প্রচলিত ছিল সেগুলির মধ্যে ছিল উৎপাদিত কৃষিপণ্যের জন্য চাষিদের ন্যূনতম সহায়ক দাম (এমএসপি) প্রদান এবং ভোক্তাদের জন্য খাদ্যদ্রব্যের সস্তা দরে বা ভরতুকি-যুক্ত রেশনিং ব্যবস্থা। প্রথম থেকেই বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ভারতের মতো উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলির উপর লাগাতার চাপ দিয়ে বলেছে, খাদ্য নিরাপত্তার নামে ভারতের মতো দেশগুলি খাদ্যফসলের যে মজুত ভাণ্ডার গড়ে তুলেছে এবং গরিবদের জন্য সস্তা দরে চাল-গম সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে তার ফলে ভারত মুক্ত বাণিজ্য নীতির বিরোধী ভূমিকা নিচ্ছে, কেননা এর ফলে ভারতে ফসলের দাম নিম্নমুখী থাকছে, ফসল রপ্তানিকারক দেশ ও কৃষি ব্যবসায়ী বহুজাতিক কোম্পানিগুলো 'ক্ষতিগ্রস্ত' হচ্ছে। এ ছাড়া, চাল-গম সহ বিভিন্ন খাদ্যশস্য উৎপাদনে ন্যূনতম সহায়ক দাম ব্যবস্থা চালু থাকার ফলে ফসলের দাম বাঁধা থাকছে অথবা বিশ্ব বাজারের তুলনায় কম থাকছে। ফলে এই দেশে কৃষিপণ্য রপ্তানিকারক দেশ ও কোম্পানিগুলি ঢুকতে পারছে না। সুতরাং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য উন্নত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির দাবি ছিল ঐ ব্যবস্থাগুলিকে সত্বর তুলে দিতে হবে। অর্থাৎ, গণবণ্টন ব্যবস্থা বজায় রাখা এবং খাদ্যদ্রব্যের দাম কম রাখার জন্য সরকার যে ভরতুকি প্রথা চালু রেখেছে তাকে অবিলম্বে তুলে দেওয়ার জন্য ভারত সরকারের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করা হয়। এছাড়া, কৃষিজ পণ্য উৎপাদনে যে যে খাতে ভরতুকি চালু আছে, যেমন, সার, বিদ্যুৎ, বীজ বা কম সুদে ব্যাঙ্কের ঋণ, কম খরচে কৃষিতে সরকারি সহায়তা প্রদান—এই সমস্ত ভরতুকি/ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া শুরু হল। ন্যূনতম সহায়ক দাম বাতিল করার জন্য চাপ তো ছিলই।

কিন্তু বিস্ময়কর ঘটনা হল উন্নত দেশগুলি, যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, কানাডা, ইত্যাদিরা তাদের নিজেদের দেশের কৃষকদের এবং বহুজাতিক কৃষি কোম্পানিগুলিকে বিপুল মাত্রায় ভরতুকি দেয়। অথচ ভারতের বেলায় তাদের প্রবল আপত্তি। কীভাবে এই দু'মুখো নীতি চলতে পারছে?

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা কারা ভরতুকি দিতে পারবে, আর কারা পারবে না (বা স্বল্প মাত্রায় পারবে) তার জন্য কয়েক

ধরনের ব্যবস্থাবলী গ্রহণ করেছে। সরল করে বললে, যে সব দেশ রপ্তানির জন্য খাদ্যশস্য উৎপাদন করে তাদের ক্ষেত্রে ভরতুকি ব্যবস্থা চলতে পারে। বলা বাহুল্য, এই গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি হল উন্নত ধনী দেশসমূহ। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন, তারা ২০১৬ সালে তাদের মোট চাল উৎপাদনের যথাক্রমে ৩২.৬ শতাংশ ও ৬৫.৯ শতাংশ রপ্তানি করেছে। অন্যদিকে, ভারত ২০১৬ সালে তার মোট চাল উৎপাদনের মাত্র ৬ শতাংশ এবং চিন মাত্র ০.২ শতাংশ রপ্তানি করেছে। গম উৎপাদনের ক্ষেত্রেও একই ধরনের চিত্র দেখা যায়। ২০১৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন তাদের মোট গম উৎপাদনের যথাক্রমে ৩৮.৩ শতাংশ এবং ৪৫.৭ শতাংশ রপ্তানি করেছে। অন্যদিকে, ভারত ও চিন যথাক্রমে ০.২ এবং ০.০ শতাংশ গম রপ্তানি করেছে।[১০] অর্থাৎ, যে সব দেশ ব্যাপক মাত্রায় চাল-গম রপ্তানি করে তাদের উৎপাদক ধনী কৃষক এবং বহুজাতিক শস্য কোম্পানিগুলির পোয়াবারো। তারা বিপুল ডলার/ইউরো ভরতুকি বাবদ কামিয়ে নিচ্ছে। ১৯৯৫ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাদের কৃষক ও বহুজাতিক শস্য কোম্পানিগুলিকে ভরতুকি ৬১০০ কোটি ডলার থেকে বাড়িয়ে ১৩৯০০ কোটি ডলারে নিয়ে গেছে—প্রায় ১২৮ শতাংশ বৃদ্ধি![১১]

এই বিশাল পরিমাণ ভরতুকি প্রদানের ফলে ঐ সব দেশে খাদ্যফসল উৎপাদনে যা খরচ, তার থেকে অনেক কম দামে বিদেশে খাদ্যফসল রপ্তানি করার সুযোগ পাওয়া যায়। বিশ্ববাজারে চলে উন্নত দেশগুলির এবং বহুজাতিক ফসল কোম্পানিগুলির প্রতাপ।

কিন্তু ভারতের মতো দেশে, যেখানে কৃষকদের সরাসরি ভরতুকি না দিয়ে পরোক্ষভাবে ভরতুকি দেওয়া হয়—যেমন চাল-গম-ডালের ন্যূনতম সহায়ক দাম দেওয়া এবং সস্তা দরে গণবণ্টন ব্যবস্থা চালু রাখা—বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সেই ধরনের ভরতুকির উপর ব্যাপক লাগাম পড়াতে চায়। অর্থাৎ, ভারতে যে ৮৬ শতাংশ গরিব ও প্রান্তিক চাষি এবং আরও ১৩.৪৩ শতাংশ মধ্য চাষি আছে—যারা প্রধানত নিজেদের পেট ভরানোর জন্য অথবা খুব বেশি হলে ভারতের আভ্যন্তরীণ বাজারে ফসল বেচে কোনও ক্রমে বা কিছুটা স্বচ্ছলভাবে দিন কাটায়—তাদের ক্ষেত্রে উপরোক্ত পরোক্ষ ধরনের ভরতুকি প্রথা চালু রাখা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য উন্নত দেশগুলির নাপসন্দ।[১২] উন্নত দেশগুলি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় এই জনকল্যাণমূলক তথা গরিব/প্রান্তিক মানুষের জীবনধারণ খাতে ভরতুকি প্রদানের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং ভরতুকি তুলে নেওয়ার জন্য প্রবল চাপ সৃষ্টি করেছে। এতদিন ধরে নানা রঙের কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় সওয়াল করে এই ভরতুকি ব্যবস্থা বজায় রাখতে পেরেছে। তার অন্যতম কারণ হল, ভারতে কৃষকদের ব্যাপক প্রতিবাদ ও আন্দোলন এবং অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সাথে পাওয়া। কিন্তু ঘটনাচক্রে মোড় ঘুরতে শুরু করেছে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারের আমলে।

পূর্বতন কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার ২০১৩ সালে খাদ্য নিরাপত্তা বিল এনে গণবণ্টন ব্যবস্থাকে আরও প্রসারিত করেছিল। তারা দেশের দুই-তৃতীয়াংশ গরিব মানুষকে (গ্রামে ৭৫ শতাংশ ও শহরে ৫০ শতাংশ—মোট জনসংখ্যার ৬৭ শতাংশ) ১ টাকা, ২ টাকা ও ৩ টাকা দরে চাল-গম সহ অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য বিতরণের সিদ্ধান্ত নেয়। বলা বাহুল্য, 'দান-খয়রাতি'র নামে এই সব ভরতুকির পরিমাণ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় তীব্র বিরোধিতার মুখে পড়ে। বিশেষত ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করে জানায় এর ফলে ভারতে চাল-গমের দাম আরও কমে যাচ্ছে, ফলে ভারতে খাদ্যশস্য রপ্তানির সম্ভাবনাও কমে যাচ্ছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের সংস্থা ইউএনডিপি-র ২০১৬ সালের ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ভারত সরকারকে সতর্ক করে বলে, ''খাদ্যের অধিকার'' খুব ভাল কথা—কিন্তু তা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিধিকে ''লঙ্ঘন করেছে''। এর ফলে ভারতের খাদ্য উৎপাদনে ও বণ্টনে ভরতুকি বাড়বে, যার ফলে সদস্য দেশগুলি ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যে ''নিষেধাজ্ঞা'' বসাতে পারে।[১৩] ভারতে চাষিদের থেকে ফসল সংগ্রহে ন্যূনতম সহায়ক দাম

প্রতি বছর বৃদ্ধির বিরুদ্ধে উন্নত দেশগুলি তীব্র আপত্তি জানায়। এই ন্যূনতম সহায়ক দামের প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেননা তার ফলে ভারতে সরকার-নির্দিষ্ট মান্ডির বাইরে খোলা বাজারেও ফসলের দাম বেশ কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হয়। ফলে সামগ্রিকভাবে ভারতে খাদ্যফসলের দাম কিছুটা নিয়ন্ত্রণে থাকে—যদিও ভারতের অগণিত গরিব সে খাদ্যফসল কিনতে না পেরে অর্ধাহার-অনাহারে থাকে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ইন্ডিয়া সেন্টার প্রদত্ত একটি হিসেব অনুযায়ী কানাডাতে কৃষক পিছু ভরতুকির পরিমাণ ৫.৫৬ লাখ টাকা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৫.৪৪ লাখ, চিনে ৮১৭৫, এবং ভারতে ৩৬৭৫ টাকা। অর্থাৎ, ভারতীয় চাষি পিছু ভরতুকির থেকে কানাডায় চাষি পিছু ভরতুকির পরিমাণ হল ১৫০ গুণ বেশি![১৪] প্রকৃতপক্ষে, এই ব্যাপক পরিমাণ ভরতুকির সুবাদে উন্নত দেশগুলিতে খাদ্যশস্যের দেশীয় বাজার এবং তার সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাজার দখলে রেখেছে চারটি বৃহদাকার ফসল কোম্পানি—এডিএম, বুঞ্জ, কারগিল এবং ড্রেইফাস—যাদেরকে অনেকে এবিসিডি কোম্পানিও বলে থাকে। অন্যদিকে, ২০১৫-১৬ সালের পর থেকে ২০১৯-২০ সাল পর্যন্ত ভারতে ফসলের ন্যূনতম সহায়ক দাম বেড়েছে বছরে ৪.৩৬ শতাংশ হারে। ঐ সময়সীমায় সাধারণ মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে ৫.২৬ শতাংশ হারে।[১৫] অর্থাৎ, ভারতের চাষিদের ভরতুকি দেওয়া হলেও তাদের প্রকৃতপক্ষে ক্ষতি হয়েছে।

যাই হোক, ভারতে পরোক্ষ ভরতুকি প্রথা নিয়ে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় ভারতের উপর সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সহ উন্নত ধনী দেশগুলির চাপ ক্রমশ তীব্র হতে থাকে। তাৎপর্যপূর্ণ হল, এই চাপকে এতদিন ধরে নানা কেন্দ্রীয় সরকার বেশ কিছুটা মোকাবিলা করতে পারলেও ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসা নরেন্দ্র মোদীর সরকার এই চাপের কাছে মাথা নত করতে শুরু করল। কীভাবে করল আমরা এবার সেই আলোচনায় প্রবেশ করব।

মোদী সরকার ও কৃষি সংস্কারের দিকে পদক্ষেপ

ভারতে চাষিদের উৎপন্ন ফসলের জন্য প্রদত্ত ন্যূনতম সহায়ক দাম এবং গরিবদের জন্য সস্তা দরে গণবণ্টন ব্যবস্থা—এই দু'টি ব্যবস্থার ইতিহাস বেশ পুরনো। ১৯৬৬-৬৭ সালে চালু হয় ন্যূনতম সহায়ক দাম, যাতে ভারতের চাষিরা ফসল উৎপাদনে যে খরচ হয়, তার থেকে বেশি দাম পায়। অন্যথায় তাদের লোকসান হত, খাদ্যফসল উৎপাদনে তারা উৎসাহ পেত না, ফলে দেশ খাদ্যসংকটে ভুগত। উপরন্তু, খাদ্যফসলের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যও উপরোক্ত ন্যূনতম সহায়ক দামের প্রয়োজনীয়তা ছিল। অর্থাৎ, এককথায় সরকার খাদ্যফসলের বাজারে দাম নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন অনুভব করেছিল। ফসল বিক্রেতা ও ভোক্তাদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত মুক্ত বাজারে ঠেলে দিলে দেশ বিপুল পরিমাণে খাদ্য অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ত। অর্থাৎ, চাষিদের ন্যূনতম সহায়ক দাম প্রদানের পিছনে তথাকথিত এক সামাজিক মঙ্গলের প্রশ্ন জড়িত ছিল।

গণবণ্টন ব্যবস্থা গঠনের সঙ্গেও 'সামাজিক মঙ্গলের' প্রশ্ন জড়িত। গণবণ্টন ব্যবস্থা ব্রিটিশ আমলে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের আগে গঠিত হয়। ১৯৬০-এর দশকে ভারতে যখন খাদ্য সংকটের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়, তখন গণবণ্টন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি করে অনুভূত হয়। তবে খাদ্য সংকটের শঙ্কা সৃষ্টি করার পিছনে সাম্রাজ্যবাদী হাত ছিল। আমাদের খেয়ালে রাখা দরকার, ১৯৬০-এর দশকেই ভারতে সাম্রাজ্যবাদী মদতে সবুজ বিপ্লব লাগু করা হয়। ভারতে সবুজ বিপ্লব চালু করার করার ক্ষেত্রে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী সংস্থা রকফেলার ফাউন্ডেশন ও ফোর্ড ফাউন্ডেশনের বিপুল ভূমিকা ছিল। তার সঙ্গে ছিল বিদেশী বীজ, সার, কীটনাশক, আগাছানাশক, কৃষি যন্ত্রপাতি কোম্পানিগুলির স্বার্থ যারা বিশাল পরিমাণ মুনাফা করে নিয়েছিল। অর্থাৎ, ভারতে সবুজ বিপ্লব আনার পিছনে যত না ছিল ভারতের 'খাদ্যসংকট' মোকাবিলা, তার চেয়ে বেশি ভারতের কৃষিক্ষেত্রকে সাম্রাজ্যবাদী লুঠতরাজের মৃগয়াক্ষেত্র বানানোর তাগিদই কাজ করেছিল।[১৭] এছাড়া, ১৯৫০-এর দশক থেকেই ভারতে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে পিএল-৪৮০ প্রকল্পে গম আমদানি শুরু হয়, ১৯৬০-এর দশক পর্যন্ত তা চলে, যদিও তখন ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে চাল, জোয়ার, বাজরা এবং কম পরিমাণে হলেও গম উৎপাদিত হত। পিএল-৪৮০ গম আমদানিতে ভারতকে বাধ্য করার পিছনেও ছিল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ছক, কেননা সে সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচুর পরিমাণে উদ্বৃত্ত গম উৎপাদন হয়েছিল।[১৮]

তখন দেশে 'খাদ্যসংকটের' থেকেও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল উৎপন্ন খাদ্যফসলের সবার কাছে পৌঁছানো বা সুসংগঠিত গণবণ্টনের ব্যবস্থা করা। অবশ্যই তার সঙ্গে বড় পরিমাণে জড়িত ছিল সাধারণ গরিব মেহনতী জনগণের স্বল্প ক্রয়ক্ষমতা। অর্থাৎ, সুসংগঠিত গণবণ্টন ব্যবস্থা ও গরিব জনগণের স্বল্প ক্রয়ক্ষমতার আওতার মধ্যে খাদ্যফসলকে নিয়ে আসার তাগিদ সেই সময়ে অনুভব করেছিল ভারতের শাসকশ্রেণি। তারা এই তাগিদ অনুভব করেছিল কেননা, খাদ্যের অসম বণ্টন ও নীচু ক্রয়ক্ষমতার ফলে তারা বিক্ষোভ-বিদ্রোহের আশঙ্কা করছিল। বিশেষত ভারতীয় পুঁজিপতিরা যাদের উপর নির্ভরশীল ও মুখাপেক্ষী, সেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি তখন এশিয়াতে 'লাল' বিপ্লবের আশঙ্কায় ভুগছিল—ভূমিসংস্কার অসমাপ্ত থাকার কারণে যে বিপ্লবের বার্তা তখন এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল।[১৯] অর্থাৎ, 'লাল' বিপ্লবকে ঠেকানোর জন্য সবুজ বিপ্লব চালু করা এবং গণবণ্টন ব্যবস্থাকে সুসংগঠিত করার প্রয়োজন উপস্থিত হয়েছিল ভারতের শাসকশ্রেণির কাছে।

১৯৬৫ সালে তৎকালীন সরকার খাদ্যফসল সংগ্রহ ও আপৎকালীন মজুত ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ফুড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া (এফসিআই) গঠন করে। এই সংস্থা গঠনের পিছনে যে তিনটি 'সামাজিক' উদ্দেশ্য ছিল: ১) কৃষকদের জন্য কার্যকরী দামের নিশ্চয়তা, ২) সমাজের অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল অংশের হাতে গণবণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে ভরতুকি-যুক্ত খাদ্য পৌঁছে দেওয়া এবং সেই লক্ষ্য পূরণের জন্য খাদ্যফসল সংগ্রহ করা ও বণ্টন করার ব্যবস্থা করা, ৩) মৌল খাদ্যদ্রব্যের আপৎকালীন ভাণ্ডার গড়ে তোলা যাতে বাজার স্থিতিশীল থাকে।[২০]

কিন্তু, বর্তমান সরকারের কাছে এই ব্যবস্থাগুলি অপ্রয়োজনীয়। কীভাবে এই ব্যবস্থাগুলিকে ছেঁটে ফেলে সঙ্কুচিত করা যায় সে লক্ষ্যে এখন তারা নিবেদিত। বিশেষত, পূর্বতন সরকারের সময় খাদ্য নিরাপত্তা বিলের মাধ্যমে দেশের ৬৭ শতাংশ গরিব মানুষের জন্য যে রক্ষাকবচ তৈরি করা হয়েছিল তাকে সঙ্কুচিত করার উদ্দেশ্যে মোদী সরকার ক্ষমতায় এসেই ২০১৪ সালের ২০ আগস্ট বিজেপি সাংসদ শান্তাকুমারের নেতৃত্বে এফসিআই-এর পুনর্বিন্যাস ঘটাতে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করে। ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসে এই কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। কমিটি সুপারিশ করে, যে সমস্ত রাজ্যে ফসল সংগ্রহের ধারাবাহিক ও সুগঠিত ব্যবস্থা আছে, সেই সব রাজ্য থেকে এফসিআই হাত গুটিয়ে নেবে। যেমন, পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ কিংবা মধ্যপ্রদেশ। অর্থাৎ, এফসিআই শুধু সেই সমস্ত রাজ্যগুলি থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করবে যেখানে সরকার নিয়ন্ত্রিত মান্ডি বা বাজার অসংগঠিত বা অনুপস্থিত। কমিটির মতে, দেশের ৬৭ শতাংশ মানুষকে স্বল্প দামে খাদ্যশস্য দেওয়া যাবে না, সংখ্যাটা ৪০ শতাংশে নামিয়ে আনতে হবে। এছাড়া, ১-৩ টাকা কেজি দরে খাদ্যশস্য দেওয়া যাবে না। ঐ দাম বাড়াতে হবে। চাষিদের থেকে যে ন্যূনতম সহায়ক দামে খাদ্যশস্য সংগৃহীত হয় তার অর্ধেক দামে গ্রাহকদের খাদ্যশস্য কিনতে হবে।[২১] শান্তাকুমার কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী চললে দেশ জুড়ে যে গণবণ্টন ব্যবস্থা প্রচলিত এবং গরিবের থেকেও গরিবের জন্য যে খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে তার যে মৃত্যুঘণ্টা বাজবে তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

শান্তাকুমার কমিটির মাধ্যমে গণবণ্টন ব্যবস্থাকে সঙ্কুচিত করা ও এফসিআই-কে বহুলাংশে গুটিয়ে ফেলার চক্রান্তের পিছনে অবশ্যই সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার হাত আছে। আমরা আগেই দেখেছি, ১৯৯১ সালে উদারনীতি গ্রহণের সময় কীভাবে বিশ্ব ব্যাঙ্ক তার নির্দেশাবলীতে উপরোক্ত সংস্কার করতে বলেছিল।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাতেও উন্নত দেশগুলি ভারত সরকারের উপর তীব্র চাপ সৃষ্টি করেছিল। ফলে শান্তাকুমার কমিটির রিপোর্ট যে সাম্রাজ্যবাদীদের ইচ্ছাপূরণ করার জন্যই করা হয়েছে তা বলা বাহুল্য।

শান্তাকুমার কমিটির রিপোর্টকেই সরকার এখন অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে। এখন সরকার বলছে দেশে খাদ্যফসলের কোনও ঘাটতি নেই, শস্যভাণ্ডার উপচে পড়ছে। এফসিআই-এর গুদামে উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে প্রচুর ফসল নষ্ট হচ্ছে, দেশে নানা প্রান্তে ফসল বণ্টনের কাজ করতে গিয়েও ফসল নষ্ট হচ্ছে, তাই শস্যভাণ্ডার বজায় রাখা না কি আখেরে ক্ষতি। অর্থাৎ, যে যুক্তিতে এফসিআই-এর মাধ্যমে একটি আপৎকালীন শস্যভাণ্ডার গড়ে তোলা হয়েছিল, সেই যুক্তিকে সরকার এখন নিজেই নাকচ করে দিচ্ছে। এছাড়া, বলা হচ্ছে দেশের হাতে না কি এতটাই বিদেশী মুদ্রা সঞ্চিত আছে যে প্রয়োজনে বিদেশ থেকে ফসল আমদানি করা না কি কোনও ব্যাপারই নয়। সুতরাং, সরকার যে তিনটি কৃষি বিল এনেছে তার মাধ্যমে তারা বলতে চাইছে—চাষিদের মুক্ত বাজারে ফসল বেচার 'স্বাধীনতা' দেওয়া প্রয়োজন যাতে চাষিরা দ্বিগুণ লাভ করতে পারে।

অর্থাৎ, চাষিদের থেকে ন্যূনতম সহায়ক দামে খাদ্যফসল কিনে নিয়ে শস্যভাণ্ডার গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তাকেই তারা নাকচ করে দিচ্ছে। সহায়ক দাম দেওয়ার মাধ্যমে বাজারে খাদ্যফসলের দামে লাগাম পড়ানোর উদ্দেশ্যকেও তারা বাতিলের খাতায় ফেলে দিচ্ছে। এককথায়, সরকার-নিয়ন্ত্রিত বাজারের বদলে মুক্ত বাজারে চাষিদের ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। মুক্ত বাজারে খাদ্যফসলের দাম না পেলে (অর্থাৎ ক্ষতি হতে থাকলে) চাষিরা যাতে তুলো, পাট, আখের মতো অর্থকরী ফসল, কিংবা ফল, ফুল, সব্জি, কফি, ইত্যাদি চাষ করে আন্তর্জাতিক চাহিদাসম্পন্ন বাজারের দিকে ঝোঁকে ঘুরিয়ে তারই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কৃষি সংস্কারের সমর্থক বিশেষজ্ঞরা ইতিমধ্যে বিশ্ববাজারে উপরোক্ত ফসলগুলির বিপুল চাহিদার গল্প ফেঁদে বসেছেন। অবশ্য এর আগেও ভারত সরকার চাষিদের চাল-গম সহ বিভিন্ন খাদ্যশস্য উৎপাদনের বদলে অর্থকরী বাণিজ্যিক ফসলের দিকে আকৃষ্ট করতে চেয়েছে। ২০০১ সালের ৬ মার্চ এনডিএ সরকারের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী কৃষকদের প্রতি আহ্বান রাখেন,

> ধান ও গমের উপর থেকে নজর সরাও।... ফল, ফুল, তৈলবীজ ও সব্জি উৎপাদনে মন দাও কেননা এগুলির রপ্তানির উত্তম সম্ভাবনা আছে।[২২]

অর্থাৎ, মোদী সরকারের পূর্বসূরী এনডিএ সরকারের একই উদ্দেশ্য ছিল। এছাড়া, বর্তমান কৃষি সংস্কারের ফলে গণবণ্টন ব্যবস্থা থাকবে নাম-কা-ওয়াস্তে, প্রয়োজনে (বা আপৎকালীন পরিস্থিতিতে) খাদ্যফসল না কি বিদেশ থেকে আমদানি করা হবে। অর্থাৎ, এফসিআই যাতে ক্রমে ক্রমে লালবাতি জ্বালে তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সরকারের 'বহু প্রশংসিত' কৃষি আইনগুলি এই উদ্দেশ্যেই রচিত।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি যেভাবে উল্টো পথে হাঁটতে শুরু করেছে তাতে স্পষ্ট যে তারা এখন পুরোপুরি সাম্রাজ্যবাদীদের নির্দেশিত পথেই এগোতে চায়। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় আগে ভারতের পূর্বতন সরকারগুলি সওয়াল করেছিল যে, 'উন্নয়নশীল দেশগুলিকে তাদের দেশীয় নীতি গ্রহণের সুবিধা দেওয়া উচিত যাতে তারা কৃষিক্ষেত্রের উপর নির্ভরশীল ব্যাপক মানুষকে কাজ দিতে পারে এবং খাদ্যশস্যের প্রাপ্যতা সুনিশ্চিত করার মাধ্যমে গরিব মানুষের আয় বাড়াতে পারে। ভারতে কৃষি একটি শ্রমনির্ভর ক্ষেত্র। কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত সিংহভাগ চাষিই কোনও ক্রমে দিনাতিপাত করে। খাদ্যশস্য রপ্তানি নয়, ভারতের মতো দেশের লক্ষ্য খাদ্যে স্বয়ম্ভর হয়ে ওঠা যাতে ব্যাপক গরিব মানুষ খেতে পায়'।[২২] বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় ভারত সরকার যে নীতি এতদিন অনুসরণ করে এসেছিল এখন তা থেকে তারা স্পষ্টভাবেই সরে আসছে। তারা বিদেশের খাদ্যশস্যের উপর ভারতের গরিব মেহনতী মানুষকে নির্ভরশীল করে তুলতে চাইছে। অন্যদিকে, ভারতে খাদ্যশস্য উৎপাদনের থেকে সরে এসে

চাষিদের বিভিন্ন বাণিজ্যিক কৃষিপণ্যের চাষে ঠেলে দিতে চাইছে। আন্তর্জাতিক মুক্ত বাজারে দানবাকার বহুজাতিক শস্য কোম্পানি ও উন্নত দেশগুলির সঙ্গে ভয়ংকর অসম প্রতিযোগিতার মুখে ভারতের চাষিদের ফেলে দিতে চাইছে। বস্তুত, এর ফলে একমাত্র লাভবান হবে ভারতের বেসরকারি পুঁজি, কর্পোরেট ব্যবসা এবং বিদেশী বহুজাতিক পুঁজি। এখানকার চাষিদের থেকে তারা যাতে যে কোনও দামে ফসল কিনে নিতে পারে তারই ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বলা বাহুল্য, এই মুক্ত বাজারে ভারতে খাদ্যশস্যের দাম হবে আকাশছোঁয়া, বা গরিব মেহনতী মানুষের একেবারে নাগালের বাইরে।

এই প্রসঙ্গে মোদী সরকারের আরও একটি দানবীয় বিলের উল্লেখ প্রয়োজনীয়। তাদের দ্বিতীয় বিলটি হল নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের দামের উপর থেকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়া। যেমন, চাল-গম সহ নানা দানাশস্য, ডাল, তৈলবীজ, আলু পেঁয়াজ, ইত্যাদির দামের উপর যে নিয়ন্ত্রণ কায়েম ছিল ঐ বিলটি তা প্রত্যাহার করে নিয়েছে। ফলে বাজারে ঐ সব পণ্যের দাম এখন মুক্ত বাজারি নিয়মে ওঠানামা করবে। মজুতদারি ও কালোবাজারির উপর কোনও সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। প্রকৃতপক্ষে, এগুলি আইনি হয়ে উঠবে। উঁচুদামের সুবিধা নেবে বড়-ছোট নানা ব্যবসায়ী ও কর্পোরেট সংস্থা। ইতিমধ্যে আলু ও ভোজ্যতেলের অতিরিক্ত দাম বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই ঘটনা দেখা গেছে। আগামী দিনে দামের অনিশ্চয়তা বা দামের বৃদ্ধি হতে চলেছে যে লাগামছাড়া তা চোখ বুজে বলে দেওয়া যায়। এর ফলে খাদ্যপণ্যগুলি কোটি কোটি গরিব মেহনতী মানুষের নাগালের বাইরে বেড়িয়ে যাবে। এককথায়, তারা প্রায় বুভুক্ষু অবস্থায় থাকবে।

চুক্তি চাষ ও দেশী-বিদেশী কর্পোরেট সংস্থা

মোদী সরকারের তৃতীয় বিলটি হল চুক্তি চাষকে আরও নিয়মিত, ধারাবাহিক ও আইনসঙ্গত করে তোলা। ভারতে বহু দিন ধরেই চুক্তি চাষ প্রচলিত এবং তার অভিজ্ঞতা চাষিদের কাছে আদৌ সুখকর নয়। প্রকৃতপক্ষে, চুক্তি চাষ হল ব্রিটিশ আমলে বাংলা-বিহারে যেভাবে চাষিদের দিয়ে জবরদস্তি নীল চাষ ও আফিম চাষ করানো হত, তার আধুনিক রূপ। সেই আমলে কোম্পানির লোক বা নীলকর সাহেবের নায়েব বরকন্দাজরা চাষিদের দাদন দিত। চাষিরা বাধ্য থাকত সাহেবদের পছন্দমতো কৃষি উৎপাদনে।

আধুনিক কালে বড় বড় দেশী-বিদেশী কোম্পানির প্রতিনিধিদের মাধ্যমে—যে প্রতিনিধিরা সাধারণত গ্রামে মোড়ল-মুরুব্বি স্থানীয় বা যাদের উপরমহলে রাজনৈতিক স্তরে বড়সড় যোগাযোগ আছে—তাদের মাধ্যমে চাষিরা কোম্পানির নির্দিষ্ট করে দেওয়া ফসল উৎপাদন করতে চুক্তিবদ্ধ হয়। যেমন, চাল-গমের বদলে আলু, টমেটো, আখ বা লঙ্কা চাষের চুক্তি। কোম্পানির লোকের মাধ্যমে ফসলের দাম আগাম নির্ধারিত হয়। কোম্পানি থেকে চাষিদের আগাম ঋণ দেওয়া হয় চাষের খরচের জন্য। ঐ কোম্পানির লোকেরাই ঠিক করে দেয় চাষিরা কী ফসল ফলাবে, কতখানি ফলাবে, ফলনের গুণমান কী রকম হবে, কী বীজ ব্যবহৃত হবে, চাষিরা কী সার দেবে, পোকা মারার জন্য কোন ওষুধ দেবে, কী পদ্ধতিতে চাষ হবে, ইত্যাদি হাজার রকম নিয়মকানুন। চাষের পর ফলনের গুণমান কোম্পানির আশানুরূপ না হলে তারা অনেক কম দাম দেবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কোনও কারণে ফলন ভাল না হলে তার দায়িত্ব নিতে হবে চাষিদেরই। এমনকি মাঠে ফলন ওঠার সময় বাজারে ফলনের দাম বেশি থাকলেও চাষিরা চুক্তির বাইরে গিয়ে খোলা বাজারে তার ফসল বেচতে পারবে না। লোকসান হলেও কোম্পানিকেই ঐ ফসল বেচতে হবে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে কোম্পানির নির্দিষ্ট করা ফসল চাষ করতে গিয়ে জমিতে লাগাতার একফসলী চাষ হচ্ছে। অর্থাৎ, বহুফসলী চাষের মাধ্যমে জমির যে উর্বরতা রক্ষা হয় সেই নিয়মকে কাঁচকলা দেখানো হচ্ছে। ফলে জমির উর্বরতা ব্যাপক মাত্রায় কমে যাচ্ছে।

এছাড়া, চুক্তি চাষে বড় বড় কর্পোরেট সংস্থা ও পেপসিকো, আইটিসি, হিন্দুস্থান লিভারের মতো বৃহৎ বহুজাতিক কোম্পানিগুলো সাধারণত জমি যাদের বেশি আছে এমন চাষিদের সঙ্গে চুক্তি করতে চায়। চুক্তি চাষে প্রাধান্য দেওয়ার অর্থ হল, গরিব ও প্রান্তিক চাষিদের জমি মাঝারি-বড় কৃষকদের হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়া। ভারতে নমঃ নমঃ করে যেটুকু ভূমি সংস্কার হয়েছে, তার উল্টো পথে হাঁটা।

বস্তুত, চুক্তি চাষ ভারতের আগে আমেরিকা, কানাডা, মেক্সিকো, ইত্যাদি দেশে বহুল প্রচলিত হয়ে উঠেছে বিগত ১৯৭০-১৯৮০-এর দশকেই। বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলো এক লম্বা সরবরাহ শৃঙ্খল গড়ে তুলেছে যার এক প্রান্তে থাকে চাষিরা। চাষিদের যে ঋণ দেওয়া হয় নির্দিষ্ট ফসল, ফলমূল, ফুল, পোলট্রি, শুয়োর বা গরু চাষের জন্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রে চাষিরা সেই ঋণ আর শোধ করতে পারে না। বরং ঋণের সুদ ও আসল শোধ করার জন্য তাকে আবার ঐ কোম্পানির কাছে হাত পাততে হয়। আমেরিকার পোলট্রি চাষিরা নিজেদের কোম্পানির ''দাস'' বলছে এমন দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়।[২৪]

কিন্তু বহুজাতিক কোম্পানিগুলির কাছে মানুষের স্বাধীানতার চেয়ে মুনাফা করা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই বিভিন্ন দেশে নানা অভিযোগ উঠলেও বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশ এবং অনুন্নত দেশগুলির চাষিদের উপর চুক্তি চাষ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। মোদী সরকারও এই সাম্রাজ্যবাদী প্রকল্পে অন্তর থেকে সায় দিয়েছে। ২০১৭ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ (সিআইআই)-এর এক সভায় চুক্তি চাষে বর্তমান সময়টা উপযুক্ত এমন ভাষণে বলেন, ''চুক্তি চাষে, কাঁচা মালের সন্ধানে এবং কৃষিগত যোগাযোগ গড়ে তোলার জন্য আরও বেশি বিনিয়োগ দরকার। ভারতে অনেক আন্তর্জাতিক কোম্পানি চুক্তি চাষে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে।''[২৫]

অর্থাৎ, কৃষি বিলের মাধ্যমে চুক্তি চাষকে আরও পাকাপোক্ত আইনি রূপ দেওয়ার মধ্যে আশ্চর্যজনক কিছু নেই। এমনকি পঞ্জাবে, তামিলনাড়ুতে চুক্তি চাষ করতে গিয়ে বহু ব্যর্থতার নজির থাকলেও মোদী সরকার তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত নয়। তাদের কাছে একমাত্র পাখির চোখ হল আরও বেশি করে দেশী-বিদেশী কোম্পানির পুঁজি বিনিয়োগ ও তাদের মুনাফা। চুক্তি চাষে ক্ষতিগ্রস্ত চাষিরা আদালতের দ্বারস্থ হবে এমন সুযোগও বর্তমান কৃষি বিলে স্থান পায়নি। দেশীয় কর্পোরেট ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলির পুঁজির জোর ব্যাপক এবং তাদের হাত এতটাই লম্বা যে সরকারি আমলাদের প্রভাবিত করা তাদের পক্ষে কোনও ব্যাপারই নয়। নতুন আইনে কোম্পানির সঙ্গে বিরোধ দেখা দিলে চাষিদের এখন থেকে যেতে হবে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। তিনি ও তাঁর উপরে থাকা কালেক্টর সাহেবরা এই বিরোধ মীমাংসা করবেন। বলা বাহুল্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রায় নিরক্ষর বা অল্প শিক্ষিত চাষিরা—যাদের জমির পরিমাণ অত্যন্ত কম, উপরের আমলা স্তরে যারা কোনও নাগাল পায় না, যারা আইনের প্যাঁচ-পয়জার জানে না—বিরোধের মীমাংসা যে তাদের পক্ষে আসবে না তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। অর্থাৎ, চুক্তি চাষ সম্বন্ধীয় কৃষি বিল অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেশীয় কর্পোরেট ও বহুজাতিক পুঁজির কাছে চাষিদের দাসখত লিখে দেওয়ার বন্দোবস্ত করেছে।

প্রকৃতপক্ষে, ভারতে (এবং অন্যান্য দেশে) চুক্তি চাষের ক্ষীরননী ভোগ করেছে দেশের বা বিশ্বের সম্পত্তিবান ও ধনী ব্যক্তিরা। প্যাকেটের আলুভাজা বা প্যাকেট-বন্দি টমেটো সস, পোলট্রির মুরগি, ভুট্টা কিংবা সয়া, ইত্যাদির বিশ্ববাজারে যে চাহিদা আছে তা প্রকৃত অর্থে মুষ্টিমেয় ধনবানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সর্বোপরি, চুক্তি চাষ মানে হল, ভারতের আপামর জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় ফসলের চাষআবাদ লাটে ওঠা। যাতে কোম্পানির মুনাফা বেশি, চাষ হবে সেগুলো। অর্থাৎ, বড়লোকদের ভোগের জন্য ও রপ্তানিযোগ্য পণ্যদ্রব্য। ফলে দেশের খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বনির্ভরতা ধুলোয় লুটোবে। খাদ্যশস্য আমদানি হবে বিদেশ থেকে। সেগুলির দাম হবে আকাশছোঁয়া।

ভারত-মার্কিন প্রস্তাবিত কৃষি চুক্তি

২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন ভারত সফরে আসেন, তখন কথা ছিল ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (Free Trade Agreement বা FTA) সম্পাদিত হবে। এই চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল মার্কিন কৃষিপণ্য যাতে ভারতে অবাধে ঢুকতে পারে তার ব্যবস্থা করা। বস্তুত, ভারতের কৃষিপণ্যের বাজারে ঢোকার জন্য মার্কিন বহুজাতিকরা খুবই ব্যগ্র। পাঁচজন মার্কিন সেনেটর তার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রীর প্রতি একটা চিঠিও লিখে ফেলেছিলেন। তাতে লেখা হয়েছিল,

> গত দশ বছর ধরে গ্রামীণ আমেরিকার অর্থনৈতিক কার্যকলাপে রপ্তানির জন্য ১২৫ কোটি ডলার ঢালা হয়েছে। ভারতের বাণিজ্য বাধাগুলি কমিয়ে আনলে গ্রামীণ আমেরিকার অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার সুযোগ পাওয়া যাবে।[২৬]

বার্তাটি ছিল স্পষ্ট। ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসে সংবাদসংস্থা রয়টার জানিয়েছিল, আসন্ন ভারত-মার্কিন কৃষি চুক্তির ফলে ৫০০ থেকে ৬০০ কোটি ডলারের মার্কিন কৃষিপণ্য ভারতে ঢুকতে পারে।[২৭]

ঐতিহাসিকভাবে ভারতের বাজারে মার্কিন কৃষিপণ্য ঢেলে দেওয়ার দৃষ্টান্ত কম নয়। ১৯৫০-৬০-এর দশকে ভারতের 'খাদ্য সংকট' সামলানোর নামে পিএল-৪৮০ গম রপ্তানি, কিংবা ১৯৯৮ সালে ভারতে প্রতি টন ২০০ ডলার দরে সয়া রপ্তানি, যার ফলে বহু সয়া চাষি ও প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের মৃত্যুঘণ্টা বেজে গিয়েছিল। অথবা ২০০৫ সালে দুই দেশের মধ্যে কৃষি চুক্তির ফলে প্রতি মেট্রিক টন ৪০০ ডলার দরে মার্কিন (বস্তুত কারগিল কোম্পানির) গম আমদানি, যখন আন্তর্জাতিক বাজারে গমের দাম ছিল মেট্রিক টন পিছু ১৫২ ডলার।[২৮]

আমেরিকার কৃষিব্যবস্থা যে ব্যাপক মাত্রায় ভরতুকি-সম্পন্ন তা আমরা আগেই দেখেছি। এছাড়া এই কৃষি ব্যাপক পরিমাণে রপ্তানি-নির্ভর। বহু দেশকে কখনও হুমকি দিয়ে বা নানা রকম আর্থিক ছাড়ের গাজর ঝুলিয়ে তারা সে দেশের বাজারে জোর করে ঢুকেছে এবং সে দেশের কৃষিক্ষেত্র ও তার উপর নির্ভরশীল কৃষকদের জীবনধারণে বারোটা বাজিয়েছে। সে তুলনায় ভারতীয় কৃষি ক্ষেত্র তাদের কাছে বেশ কিছুটা অধরা। সুতরাং ভারতের কৃষি ক্ষেত্রে জবরদস্তি ঢোকার জন্য তারা এখন মরিয়া। ২০১০ সালে মার্কিন সেনেটে তৎকালীন বাণিজ্য সচিব রন কার্ক রাগত কণ্ঠে বলেছিলেন,

> আমরা ভীষণ রকম হতাশ। আমি আপনাদের কাছে বলতে চাই যে কোনও দেশের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেব কি না তা খোলাখুলি আলোচনা করা আমাদের রীতি নয়, তবু আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি প্রতিটি বিকল্প ও বলপূর্বক উপায় খুঁজে বের করতে যাতে আমাদের বেশ কয়েকটি কৃষিপণ্যের কাছে ভারতের বাজার খুলে দেওয়া যায়।[২৯]

২০১৯ সালে সেই ভারতীয় বাজার খুলে দেওয়ার জন্য ট্রাম্প তৎপর হয়ে উঠলেন এবং ২০২০ সালে ভারত-মার্কিন কৃষি চুক্তির সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত ভারতে ট্রাম্প সাহেবের সফরের সময় অন্যান্য কিছু ব্যাপারে ঐকমত্য না হওয়ার ফলে প্রস্তাবিত কৃষি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়নি। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে সেই চুক্তি হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা বিরাজ করছে। ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসে জানা যাচ্ছে নতুন মার্কিন রাষ্ট্রপতি বাইডেন প্রশাসনের অধীনে এফটিএ চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি দপ্তর জানিয়েছে, ভারতে আমেরিকা থেকে দুগ্ধজাত দ্রব্য, ভোজ্য তেল, ডাল, বাদাম ও ফল রপ্তানির যেমন সুযোগ রয়েছে, তেমনই ভারত থেকে চাল, তুলো ও মোষের মাংসের আমেরিকাতে রপ্তানির সুযোগ রয়েছে।[৩০] ভারত-মার্কিন প্রস্তাবিত কৃষি চুক্তির সঙ্গে ভারতের তিনটি কৃষি বিলের যথেষ্ট সম্পর্ক আছে এমন অনুমান করা কি অসঙ্গত?

গত তিন বছরে আমেরিকা দক্ষিণ কোরিয়া, কানাডা, মেক্সিকো, এমনকি চিনের সঙ্গেও কৃষি বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত করেছে। এর ফলে সেই দেশগুলিতে সাধারণ খাদ্যশস্য তো বটেই, এমনকি জিনগত ভাবে পরিবর্তিত (জিএম) ফসল প্রবেশেরও চুক্তি হয়েছে। ভারত এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে অন্যতম প্রধান টার্গেট। এর ফল

হতে পারে সর্বনাশা। ভারতের কৃষকদের হাতে যেখানে গড়ে ১ হেক্টর করে জমি আছে, সেখানে মার্কিন চাষিদের (বা কোম্পানিদের) হাতে আছে গড়ে ১৭৬ হেক্টর বা ১৭৬ গুণ বেশি জমি। আমেরিকার কৃষিতে যেখানে মাত্র ২ শতাংশ বা ২১ লক্ষ কৃষক (কৃষি-শ্রমিক সমেত) যুক্ত, সেখানে ভারতের অর্ধেকেরও বেশি বা ৬৫-৭০ কোটি মানুষ কৃষি ক্ষেত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত। আমেরিকার কৃষিক্ষেত্র থেকে কৃষকদের পরিবার পিছু বার্ষিক গড় আয় হল ১৮,৬৩৭ ডলার। ভারতে তা ১০০০ ডলারও নয়।[৩১] ভারতের সঙ্গে এই ধরনের ব্যাপক বৈষম্য আছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বা কানাডার মতো ধনী দেশগুলির সঙ্গেও। ফলে ঐ সব দেশগুলি থেকে ঢালাও ভাবে কৃষিপণ্য ভারতে আমদানি শুরু হলে ভারতের কোটি কোটি মানুষের জীবন-জীবিকায় কী ধরনের সর্বনাশ হবে তা অনুমান করা খুব কঠিন নয়।

‘নিউ ভিশন ফর এগ্রিকালচার’: লুণ্ঠনের নয়া ছক

সাম্রাজ্যবাদী সংস্থা ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম কয়েক বছর আগে এক ‘নিউ ভিশন অব এগ্রিকালচার’ (এনভিএ) প্রকল্প চালু করে। রাষ্ট্রপুঞ্জ চালু করে ‘ইউএন ২০৩০ অ্যাজেন্ডা’। এরা উভয়েই উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলিতে কৃষি ক্ষেত্রে উদারীকরণ ও কৃষির উপর কর্পোরেট আধিপত্য কায়েমের উদ্দেশ্যে এক মডেল উপস্থিত করেছে যার সঙ্গে মোদী সরকারের কৃষি বিলের আশ্চর্য রকম মিল।

বারো বছরের বেশি সময় ধরে ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম, এনভিএ এবং তাদের স্যাঙাত রকফেলার ও বিল গেটস ফাউন্ডেশন আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা ও এশিয়াতে তাদের কৃষি কর্মসূচী ঢোকানোর ব্যাপক প্রচেষ্টা চালিয়ে এসেছে। তাদের আগামী টার্গেট হল ভারত, যেখানে কৃষিক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ জমি, ব্যবসা-বাণিজ্য জড়িত। রাষ্ট্রপুঞ্জ ঘোষণা করেছে যে তারা ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে খাদ্য ব্যবস্থার একটি শীর্ষবৈঠক অনুষ্ঠিত করবে যার আসল লক্ষ্য হল ভারত সহ নানা উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলির কৃষিক্ষেত্রে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী ফাউন্ডেশন এবং বহুজাতিক কৃষি কোম্পানির অনুপ্রবেশকে সহজ ও সরল করে তোলা। উক্ত শীর্ষবৈঠকের বিশেষ রাষ্ট্রদূত পদে রাষ্ট্রপুঞ্জ এমন এক ব্যক্তিকে নিয়োগ করেছে যিনি আফ্রিকার রোয়ান্ডার প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী। তাঁর আরও একটি পরিচয় হল আফ্রিকায় বিল গেটস ফাউন্ডেশন যে সাম্রাজ্যবাদী সবুজ বিপ্লব (যার পোষাকী নাম AGRA) প্রকল্প পরিচালনা করছে, তিনি তার সভাপতি। এই বিল গেটস ফাউন্ডেশন পরিচালিত AGRA সবুজ বিপ্লব প্রকল্প আফ্রিকার কৃষি ক্ষেত্রে ব্যাপক সর্বনাশ ডেকে এনেছে।[৩২] ২০২০ সালের স্বয়ং AGRA রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য। যেমন,

> AGRA প্রকল্প শুরু হওয়ার আগে প্রধান খাদ্যশস্যগুলির উৎপাদনশীলতা যে রকম স্বল্প ছিল, AGRA প্রকল্প শুরু হওয়ার পর সেই উৎপাদনশীলতা একই জায়গায় থেকে গেছে। AGRA শুরু হওয়ার পর ১৩টি দেশে ক্ষুধা অর্ধেক হওয়ার পরিবর্তে তা আরও বর্ধিত হয়েছে। AGRA চালনাকালে ক্ষুধাপীড়িত মানুষের সংখ্যা ৩০ শতাংশ বেড়ে গেছে... [ফলে] মোট ১৩টি দেশে ১৩ কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।[৩৩]

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য হল, AGRA প্রকল্পের ফলে আফ্রিকার কৃষিক্ষেত্রকে ভুবনীকরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে শক্তপোক্ত ভাবে যুক্ত করা হয়েছে, সস্তা কৃষি উপকরণ সরবরাহ করার নামে আফ্রিকার দেশগুলিতে বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলির কব্জা আরও এঁটে বসেছে। আফ্রিকায় জিএম ফসলের ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটেছে, যেমন ভুট্টা বা সয়া—যেগুলি বিদেশে ব্যাপক পরিমাণে রপ্তানি হচ্ছে। এমনকি বিল গেটস-এর ২০০৮-১১ সালের একটি গোপনীয় রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, আফ্রিকায় যাতে কৃষিজ উৎপাদনে শতকরা কম শ্রম লাগে তারও পরিকল্পনা তারা লাগু করছে।[৩৪] কম শ্রম লাগার অন্তর্নিহিত অর্থ হল উৎপাদন পিছু কম চাষি। অর্থাৎ, বহু চাষির জমি ও জীবিকা হারানো।

বিল গেটস ও রকফেলার ফাউন্ডেশন আফ্রিকার কৃষি ক্ষেত্রে যেমন সর্বনাশ ডেকে এনেছে তা ভারতের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম ভারতের কৃষিক্ষেত্রে প্রবেশ, কৃষকদের অসম প্রতিযোগিতার সামনে ফেলে দিয়ে তাদের জমি দখল, কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার্থে যে সব আইন-কানুন আছে তার ব্যাপক সংস্কার, ইত্যাদির জন্য 'এনভিএ ইন্ডিয়া বিজনেস কাউন্সিল' নামক একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী গঠন করেছে। এই গোষ্ঠীর ঘোষিত উদ্দেশ্য হল,

> এনভিএ ইন্ডিয়া বিজনেস কাউন্সিল হল একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অপ্রাতিষ্ঠানিক সংস্থা যারা ভারতে টেকসই কৃষিগত বৃদ্ধির জন্য বেসরকারি উদ্যোগ ও বিনিয়োগকে উৎসাহিত করবে।[৩৫]

এই বিজনেস কাউন্সিলের ঘোষিত লক্ষ্য অত্যন্ত স্পষ্ট। কীভাবে ভারতের কৃষি ক্ষেত্রে কর্পোরেট ও বহুজাতিক সংস্থাগুলির কব্জাকে দৃঢ় করা যায়, তারা সেই উদ্দেশ্যেই কাজ করে চলেছে। এই বিজনেস কাউন্সিলের সদস্যদের মধ্যে আছে, বিশ্বের সর্ববৃহৎ কীটনাশক ও জিএম বীজ-উৎপাদক মনস্যান্টো, বৃহৎ মার্কিন শস্য কোম্পানি কারগিল, বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ কীটনাশক উৎপাদনকারী বেয়ার কর্পসায়েন্স, ডাউ অ্যাগ্রোসায়েন্স ও দ্যুপঁ (যারা জিএম বীজ ও কীটনাশকের ব্যবসা করে), শস্য কোম্পানি লুই দ্রেইফাস কোম্পানি, ওয়াল মার্ট ইন্ডিয়া, মাহীন্দ্রা অ্যান্ড মাহীন্দ্রা (বিশ্বের সর্ববৃহৎ ট্রাক্টর কোম্পানি), নেসলে, পেপসিকো, র‍্যাবোব্যাঙ্ক ইন্টারন্যাশনাল, স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, সুইস রি-সার্ভিসেস (বিমা কোম্পানি), রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনকারী ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড এবং আদানি গ্রুপের গৌতম আদানি—ভারতের দ্বিতীয় ধনী ব্যক্তি এবং শোনা যায় বিজেপির নির্বাচনী তহবিলে সবচেয়ে বড় অর্থদাতা। এমনকি মুকেশ আমবানিও ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের বোর্ড অব ডিরেক্টর্স-এর অন্যতম সদস্য।[৩৬]

বস্তুত, ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের উদ্দেশ্য হল: ভারতের চালু কৃষিব্যবস্থা ও খাদ্যব্যবস্থাকে ভেঙে দিয়ে তাকে ভুবনীকরণ ও উদারীকরণের মডেলে পুনর্বিন্যাস করা। ঠিক যেমনটি হয়েছিল ১৯৯০-এর দশকে দেশে নয়া অর্থনৈতিক নীতির নামে উদারীকরণ নীতি গ্রহণের সময়। তখন কৃষিক্ষেত্রে বিশ্ব ব্যাঙ্কের ব্যাপক সংস্কারের উপদেশ দেওয়া হলেও এবং ধীরে ধীরে তার বেশ কিছুটা বিভিন্ন সরকারের আমলে প্রযুক্ত হলেও সামগ্রিকভাবে কৃষিসংস্কার এতদিন করা যায়নি। এবার সেটা করা হচ্ছে। এর উদ্দেশ্য হল, ভারতের ৮৬ শতাংশ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি—যাদের জমি ২ হেক্টরের কম—এমনকি তাদের থেকে একটু ভালো অবস্থায় থাকা মধ্য চাষিদেরও দেশী-বিদেশী বৃহদাকার কৃষি কোম্পানির সামনে ভয়ানক অসম প্রতিযোগিতায় ফেলে দেওয়া, তাদের জন্য বরাদ্দ সরকারি রক্ষাকবচ পুরোপুরি তুলে নেওয়া। ভারতে এমন একটি কৃষিব্যবস্থা গড়ে তোলা যা বৃহৎ কর্পোরেট ও মুষ্টিমেয় ধনী চাষির জন্য নিবেদিত। মোদী সরকারের কৃষি সংস্কার ও বিজনেস কাউন্সিলের উদ্দেশ্য যে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

কৃষক, গরিব মেহনতী মানুষের অবস্থা এবং কৃষি সংস্কার

তিনটি কৃষি আইন জারি করে মোদী সরকার কৃষকদের কাছে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সেগুলি সংক্ষেপে একটু ঝালিয়ে নেওয়া যাক। সরকার বলেছে এর ফলে চাষিরা সংকট থেকে বেরিয়ে আসবে, চাষিদের আয় দ্বিগুণ হয়ে যাবে। তিনটি আইনের মাধ্যমে চাষিরা মান্ডি ছাড়াই এবং কোনও দালাল ছাড়াই খোলা বাজারে, এমনকি ইন্টারনেটের মাধ্যমে ফসল বিক্রি করতে পারবে। এই বাজার বিস্তৃত থাকবে শুধু নিজেদের প্রদেশে নয়, বাজার বিস্তৃত হবে দেশ জুড়ে, এমনকি সমগ্র বিশ্ব জুড়ে। তার উপর, দেশে খাদ্যফসল উপচে পড়ছে, এফসিআই-এর গুদামে ফসল পচে নষ্ট হচ্ছে, ইঁদুরে খাচ্ছে। ফলে এফসিআই-এর বদলে যদি দক্ষ বেসরকারি হাতে ফসল গুদামজাত করা এবং বণ্টন করার ব্যবস্থা দেওয়া হয়, তবে ফসল নষ্ট হবে না। তাদের আরও যুক্তি হল, খাদ্যফসল

এত বেশি উৎপাদন করার দরকার নেই। চাষিদের এখন খাদ্যফসল ছেড়ে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ও অর্থকরী ফসল উৎপাদনে সরে যেতে হবে, বিদেশে যেগুলির ভাল বাজার আছে। দেশের হাতে এখন অনেক বিদেশী মুদ্রা আছে। ফলে কোনও সময়ে খাদ্যশস্যের অভাব ঘটলে বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আনিয়ে নেওয়া যাবে। গণবণ্টন ব্যবস্থার এতখানি বিস্তৃতি দরকার নেই। 'প্রকৃত' গরিবদের কাছে গণবণ্টনের মাধ্যমে খাদ্যশস্য পৌঁছে গেলেই হল। কিছু খাদ্যপণ্যকে অত্যাবশ্যকীয় আইনের বাইরে বের করে আনলে চাষিরা আরও লাভ করবে। তারপর, দেশী-বিদেশী কর্পোরেট 'বন্ধুদের' সঙ্গে চুক্তি চাষ করলে চাষিদের বিপুল লাভ হবে। কর্পোরেট সংস্থাগুলি তো চাষিদের সাহায্য করার জন্য মুখিয়ে আছে... ইত্যাদি।

সরকারের যুক্তিগুলি আমরা এক এক করে কাটাছেঁড়া করার চেষ্টা করেছি। এখন আমরা বোঝার চেষ্টা করব দেশের গরিব মেহনতী মানুষ, চাষিদের এবং ভারতের কৃষিব্যবস্থার আসল চেহারা ও রোগের লক্ষণগুলি কী যার ফলে চাষিরা গভীর সংকটগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

তথাকথিত খাদ্য-স্বনির্ভরতা

সরকার বলছে দেশে শস্যভাণ্ডার উপচে পড়ছে, গুদামে নষ্ট হচ্ছে, ইঁদুর পোকামাকড়ে খাচ্ছে। কিন্তু তা হলে দেশের কোটি কোটি মানুষ অর্ধাহার-অনাহারে ভুগছে কেন? কেনই বা কোটি কোটি মানুষ অপুষ্ট? গত বছরে এবং তার আগের বছরে ঝাড়খণ্ডে, তারও কয়েকবছর আগে খোদ দিল্লি শহরে অনাহারে মারা যাওয়ার ঘটনা ঘটল কী করে? গরিব মেহনতী মানুষদের প্রকৃত অবস্থা বোঝার জন্য কিছু বৃত্তান্ত উপস্থিত করা যাক:

১) ২০১৫-১৬ সালের ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ্ সার্ভে জানাচ্ছে, দেশের ৩৬ শতাংশ শিশু কম ওজন-সম্পন্ন এবং ৬ থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশুদের ৫৮ শতাংশ রক্তাল্পতায় ভুগছে।[৩৭] ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম জানিয়েছে, ঝাড়খণ্ড রাজ্যের চাইবাসাতে শিশুদের হাড়িয়া খাইয়ে রাখা হয় যাতে তাদের ভাত খাওয়ার ইচ্ছা কমে যায়। ঝাড়খণ্ডে ৪৮ শতাংশ পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু অপুষ্টিতে ভোগে।[৩৮] সারা দেশে ১৯ কোটি ৭ লক্ষ মানুষ অপুষ্টিতে আক্রান্ত। মহিলাদের (১৫-৪৯ বয়স পর্যন্ত) ৫১.৪ শতাংশ রক্তাল্পতায় ভোগে।[৩৯] গ্রামীণ ভারতের প্রতি তিন জনের মধ্যে দুই জন পুষ্টিকর খাদ্য পায় না।[৪০]

২) ভারতে ১৯৯১ সালে মাথাপিছু খাদ্যপ্রাপ্তি ছিল ১৮৬.২ কেজি। ২০১৬ সালে তা দাঁড়িয়েছে ১৭৭.৭ কেজিতে। এমনকি ১৯০৩-০৮ সালে, অর্থাৎ ব্রিটিশ আমলে মাথাপিছু খাদ্যপ্রাপ্তি ছিল বছরে ১৭৭.৩ কেজি।[৪১] অর্থাৎ, এখনকার বুভুক্ষু মানুষের অবস্থা ব্রিটিশ যুগের দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের সমতুল্য।

৩) ১৯৯১ সালে প্রতিদিন মাথাপিছু খাবার মিলত ৫১০ গ্রাম। ২০১৮ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষা জানিয়েছে তা এখন প্রতিদিন মাথাপিছু ৪৮৭ গ্রামে দাঁড়িয়েছে।[৪২]

৪) গ্রামীণ ভারতে ২০১১-১২ সালে খাদ্যদ্রব্যের পিছনে প্রতি মাসে মাথাপিছু ব্যয় করার ক্ষমতা ছিল ৬৪৩ টাকা। ২০১৭-১৮ সালে তা নেমে দাঁড়িয়েছে ৫৮০ টাকা। এই সময়ের মধ্যে মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে। সুতরাং ব্যয় হওয়ার কথা অনেকটা বেশি। মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও এই হ্রাস দেখায় গ্রামীণ ভারতের মানুষ আরও ক্ষুধার্ত। প্ল্যানিং কমিশনের প্রাক্তন প্রধান অভিজিত সেন জানিয়েছেন, এই তথ্য দেখাচ্ছে গ্রামীণ ভারতে অপুষ্টি বেড়ে গেছে।[৪৩]

৫) রাষ্ট্রপুঞ্জের তথ্য থেকে জানা যায়, ২০১৪-১৬ সালের মধ্যে দেশের ২৭.৮ শতাংশ মানুষ খাদ্য অনিশ্চয়তায় ভুগত। ২০১৭-১৯ সালে তা দাঁড়িয়েছে ৩১.৬ শতাংশে। সংখ্যার দিক থেকে দেখলে ২০১৪-১৬ সালে যা ছিল ৪২.৬৫ কোটি, ২০১৭-১৯ সালে তা দাঁড়িয়েছে ৪৮.৮৬ কোটি।[৪৪]

৬) বিশ্ব ক্ষুধার তালিকায় ১০৭টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ৯৪তম![৪৫]

বস্তুত, দেশের শস্যভাণ্ডার 'উপচে' পড়লেও দেশের গরিব মেহনতী মানুষের সে খাবার কিনে খাওয়ার ক্ষমতা নেই। এমনকি ২০১৩ সালে খাদ্য নিরাপত্তা বিলে দেশের ৬৭ শতাংশ মানুষের জন্য ১-৩ টাকা দরে খাদ্য বিতরণের ব্যবস্থা করা হলেও গরিব মানুষ থেকে গেছে সেই তিমিরেই। এফসিআই গুদামে যদি খাদ্য পচে নষ্ট হয়, কিংবা তা ইঁদুরে খায়, এফসিআই যদি আমলাদের কারসাজিতে অদক্ষ হয়ে পড়ে, তবে তাকে দক্ষ করে তোলার দায়িত্বই তো সরকারের নেওয়া উচিত। এফসিআই-এর দক্ষতা বাড়ানোর বদলে তাকে স্রেফ তুলে দেওয়ার ফন্দি আসলে খাদ্যশস্য গুদামজাত করা ও বণ্টন করার প্রক্রিয়াকে বেসরকারিকরণের চক্রান্ত ছাড়া আর কিছু নয়। ইতিমধ্যে, কৃষিপণ্য ব্যবসাকারী বিভিন্ন সুপারমার্কেট দখল করেছে আমবানি ও টাটা গোষ্ঠী। বৃহৎ কর্পোরেট আদানি গোষ্ঠী ইতিমধ্যে আদানি লজিসটিক্স গড়ে তুলেছে। খাদ্যশস্য বণ্টন কি তাহলে ওদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে? আসলে 'উপচে' পড়া খাদ্যভাণ্ডার ব্যবহার করে গরিব মেহনতী মানুষের ক্ষুধা নিবৃত্তি সরকারের অ্যাজেন্ডাতে নেই। দেশে খাদ্য 'উপচে' পড়ছে বলার মধ্যে তাদের অন্য কোনও ফন্দি আছে যা গরিব মানুষের স্বার্থবাহী নয়। আসলে, তারা খাদ্যভাণ্ডার 'উপচে' পড়ছে বলার মধ্য দিয়ে চাষিদের খাদ্যশস্য উৎপাদন থেকে সরিয়ে আনতে চাইছে। ধনী দেশ বা বিদেশী বহুজাতিকদের থেকে উঁচু দামে খাদ্য আমদানির দাওয়াই দিচ্ছে।

'প্রয়োজনে' বা দেশের খাদ্যের অভাব দেখা দিলে বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করার মতো অঢেল বিদেশী মুদ্রা না কি ভারতে এখন আছে। একটু চোখ কান খোলা রাখা মানুষ জানেন, ভারতের অর্থনীতি গত দুই বছর ধরে ধুঁকতে থাকলেও (অতিমারির সময় তা ব্যাপক মাত্রায় সংকুচিত হয়েছে) ভারতের শেয়ার বাজারে পরোক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ (যাকে পোর্টফোলিও বিনিয়োগ বলা হয়) উপচে পড়ছে। এ কথাও অনেকে জানেন, এই পুঁজি যখনই বিপদের গন্ধ পাবে, তখনই এ দেশ থেকে পুঁজি তুলে উধাও হয়ে যাবে। এই ধরনের ঘটনা অতীতে বহুবার ঘটেছে। তার উপর, এই বিদেশী মুদ্রার একটা বড় অংশ হল বিশ্ব ব্যাঙ্ক, নানা আর্থিক সংস্থা থেকে প্রাপ্ত ঋণ। ফলে ভারতের বিদেশী মুদ্রার ভাঁড়ার প্রকৃতই বুদবুদের মতো, কখন তা ফেটে পড়বে কেউ জানে না। তাই 'প্রয়োজনে' খাদ্য আমদানির কথা বানিয়ে বলা গপ্পো ছাড়া আর কিছু নয়।

'প্রয়োজনে' ভারত যদি আন্তর্জাতিক বাজার থেকে খাদ্যশস্য কিনতে শুরু করে, তবে ভারতের মতো বিশাল জনসংখ্যা সমৃদ্ধ দেশ আন্তর্জাতিক বাজারে যুক্ত হওয়ার ফলে খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা বহু গুণে বেড়ে যাবে। খাদ্যশস্যের দাম চড়চড় করে বাড়তে শুরু করবে। বিপুল মুনাফা করবে আমেরিকা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়ার মতো খাদ্যশস্য রপ্তানিকারক দেশ এবং বহুজাতিক শস্য কোম্পানিগুলো। ভারতের গরিব জনগণকে সেই চড়া দামের খাদ্যশস্য হয় কিনে খেতে হবে, কিংবা দুর্ভিক্ষপীড়িত হয়ে মরতে হবে। ভারত বোধহয় এইভাবেই 'আত্মনির্ভর' হয়ে উঠবে!

তার উপর, মোদী সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম সহায়ক দাম তুলে নিচ্ছে এবং বেশ কয়েকটি নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যকে অত্যাবশ্যক আইনের বাইরে ফেলে দিচ্ছে। ফলে, অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে এই সমস্ত খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়তে থাকবে। সরকার বলছে এতে না কি চাষির লাভ হবে। বাস্তব হল, ভারতের প্রায় ৯০ শতাংশ চাষি, কোটি কোটি খেতমজুর এবং শহরের অগণিত মেহনতী মানুষ এতটাই গরিব যে হয় তাদের গণবণ্টন ব্যবস্থা অথবা খোলা বাজারের উপর খাদ্যদ্রব্যের জন্য নির্ভর করতে হয়। তাই সরকার এখানেও চাষিদের ভাঁওতা দিচ্ছে।

দেশের চাষি ও খেতমজুরদের প্রকৃত অবস্থা

সরকারের ৫৭৬তম জাতীয় নমুনা সমীক্ষা জানাচ্ছে, ২০১২-১৩ সালে গ্রামীণ ভারতের মোট কৃষক

পরিবারগুলির ৬৯ শতাংশই ছিল এমন চাষি যাদের হাতে ১ হেক্টরের কম জমি আছে। ১৭ শতাংশের হাতে আছে ১ থেকে ২ হেক্টর। অর্থাৎ, কৃষিজীবী পরিবারগুলির প্রায় ৮৬ শতাংশের হাতে ২ হেক্টরের কম জমি আছে। এদেরকে সরকার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি বলে থাকে। ২০১৫-১৬ সালের কৃষি সমীক্ষার মতে ১৩.৩ শতাংশ হল আধা-মধ্য ও মধ্য চাষি যাদের হাতে ২-১০ হেক্টর পর্যন্ত জমি আছে। বলা বাহুল্য, ছোট-প্রান্তিক চাষিদের থেকে এই অংশের উপরিস্তর তুলনায় স্বচ্ছল। আর, ০.৫৭ শতাংশ চাষি হল বৃহৎ বা ধনী যাদের হাতে ১০ হেক্টরের বেশি জমি আছে।[৪৬]

১৯৭১ সালে যেখানে চাষিদের হাতে থাকা গড় জমির পরিমাণ ছিল ২.২৮ হেক্টর, ২০১৫-১৬ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১.০৮ হেক্টরে। অর্থাৎ, জমি খণ্ডীকৃত হয়েছে ব্যাপকভাবে। ফলে উৎপাদনশীলতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, অথবা খুব একটা বাড়েনি। তার উপর, জমিহীন খেতমজুরদের সংখ্যা ২০০১ সালে ছিল ১০ কোটি ৬৮ লক্ষ। ২০১১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৪ কোটি ৪৩ লক্ষ। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, ২০০১ সালে জমির মালিক চাষির সংখ্যা ছিল ১২ কোটি ৭৩ লক্ষ। ২০১১ সালে তা কমে দাঁড়ায় ১১ কোটি ৮৮ লক্ষ।[৪৭] অর্থাৎ গ্রামীণ ভারতে এখন জমিহীন খেতমজুরের সংখ্যা জমির মালিক চাষির থেকে বেশি। এগুলি শুকনো পরিসংখ্যান। জমি আছে এমন ছোট ও প্রান্তিক চাষিদের অবস্থা এমন, যে বহু ক্ষেত্রে পেট ভরানোর জন্য তারা নিজের জমি ছাড়াও অন্যের জমিতে খেতমজুরি করতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি, খেতমজুর এবং চাষের উপর পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল নানা পেশাজীবী মানুষ—যেমন ফসল পরিবহণ কর্মী, মুটে, ছোট দোকানদার, ইত্যাদি—এরা হল গ্রামের সবচেয়ে অভাবী মানুষ।

ছোট ও প্রান্তিক চাষিদের জমি চাষ করে যে ফসল উৎপন্ন হয় তা দিয়ে তাদের বছরের চার-পাঁচ মাস চলে কি না সন্দেহ। খেতমজুরদের অবস্থা হয় তার চেয়েও খারাপ বা মন্দের ভাল। বাকি সময়টাতে তাদের সরকারি গণবণ্টন ব্যবস্থা ও খোলা বাজারের উপর নির্ভর করতে হয়। ফলে গণবণ্টন ব্যবস্থার মৃত্যুঘণ্টা বাজলে বা খোলা বাজারে ফসলের দাম চড়চড় করে উঠতে শুরু করলে এরা বিরাটভাবে ধাক্কা খাবে। তার উপর নয়া কৃষি বিল অনুযায়ী এদের যদি ধনী চাষি ও দেশী-বিদেশী কর্পোরেট সংস্থাগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হয়, তাহলে তারা যে আদৌ কক্ষে পাবে না তা বলা বাহুল্য। এমনকি ভীষণ অসম প্রতিযোগিতার ফলে এদের হাত থেকে জমি ঐ ধনী চাষি ও কর্পোরেটদের হাতে চলে যাওয়ার ভালই সম্ভাবনা। কর্পোরেটদের হাতে যত জমি যাবে, জমিতে তত বেশি পরিমাণে খেতমজুরের শ্রমশক্তির বদলে যন্ত্রপাতি কাজে লাগানো হবে। এমনকি এখনই, বহু জমিতে খেতমজুরদের হাত থেকে কাজ চলে যাচ্ছে বহুল পরিমাণে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে। তখন তাদের হাতে থাকছে একমাত্র মনরেগার অধীনে একশো দিনের কাজে গতর খাটিয়ে সামান্য কিছু উপার্জন। অথবা, কাজের খোঁজে শহরের পানে ধাওয়া—সেখানেও কাজ প্রায় নেই বললেই চলে। থাকলেও দু'বেলা পেট ভরার মতো বা গাঁয়ে টাকা পাঠানোর মতো রোজগার নেই। কৃষি বিল যে এদের জীবনে সর্বনাশা তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ধরে নিতে পারি, উপরোক্ত ৮৬ শতাংশ ছোট ও প্রান্তিক চাষি পরিবারগুলিতে সদস্যসংখ্যা গড়ে ৪ থেকে ৫ জন (তার বেশিও হতে পারে)। সুতরাং তাদের ১-২ হেক্টর জমির উপর সংবৎসর ৪ থেকে ৫টি মানুষকে নির্ভর করতে হয়। ২০১৬-১৭ সালে ভারতের কৃষিজীবী পরিবারগুলির প্রতি মাসে সমস্ত উৎস থেকে গড় আয় ছিল মাত্র ৮৯৩১ টাকা। অন্যদিকে সাংসারিক খরচ, খাওয়া খরচ, ইত্যাদির জন্য পরিবার পিছু খরচ হল মাসে ৭১৫২ টাকা।[৪৮] (উদারনীতির ক্ষীরননী প্রাপ্ত দেশের উপরি স্তরের ১০ শতাংশ বিত্তবান মানুষ এই তথ্যে চমকে উঠতে পারে, কেননা তাদের ছেলেমেয়েদের মাসিক হাতখরচ এর থেকে অনেক বেশি!) অর্থাৎ, মাসে ঐ গরিব পরিবারগুলির হাতে অতিরিক্ত থাকে মাত্র ১৭৭৯ টাকা! ঐ ১৭৭৯ টাকা দিয়ে তাদের চাষের খরচ, মহাজনের আসল-সুদ মেটাতে হয়।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে, অন্ধ্রপ্রদেশের চাষি পরিবারের হাতে মাসে অতিরিক্ত জমা হয় মাত্র ৯৫ টাকা![৪৯] তা দিয়ে এক বোতল তেলও কেনা যায় না।

বলা বাহুল্য, ঐ যৎসামান্য টাকাতে না চলে সংসার, না চলে স্বাস্থ্য-শিক্ষার খরচ, না চলে চাষ-আবাদ। গণবণ্টন ব্যবস্থা সঙ্কুচিত হলে কিংবা ভরতুকিতে চাল-গম না পেলে প্রায় অনাহারে থাকার মতো অবস্থা! সুতরাং অধিকাংশ চাষিকে ধার করতে হয়। কৃষিজীবী পরিবারগুলির বাৎসরিক গড় ঋণ ১,০৪,৬০২ টাকা।[৫০] অথচ, একটু আগে আমরা দেখলাম, চাষি পরিবারগুলির গড় আয় হল মাসে ৮৯৩১ টাকা, অথবা বছরে তা ১,০৭,১৭২ টাকা। অর্থাৎ বছরে যা আয় হয় তার প্রায় সবটাই ঋণ মেটাতে চলে যায়। ২০০২-০৩ সালে ভারতের কৃষিজীবী পরিবারগুলির ৪৯ শতাংশ ঋণগ্রস্ত ছিল। নাবার্ডের সমীক্ষা জানাচ্ছে, ২০১৬-১৭ সালে এই পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫৩ শতাংশ।[৫১] চাষিরা এই ঋণ কোথা থেকে পায়? সরকারি হিসেবে ঋণগ্রস্ত চাষিদের সরকারি ব্যাঙ্ক ও সমবায় ঋণ দেয় ৪৬ শতাংশ। বাকিটা তাদের মহাজন বা ব্যবসায়ীদের থেকে ধার করতে হয়। কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে যাঁদের একটু পরিচিতি আছে তাঁরা জানেন, আসলে চাষিরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জমিদার, মহাজন, আড়তদার, সার-কীটনাশক ব্যবসায়ীদের কাছে আরও গভীরভাবে ঋণগ্রস্ত যেখানে সুদের হার অনেক বেশি। সরকারি হিসেবে যাদের হাতে ২ হেক্টরের বেশি জমি আছে তাদের ৬০ শতাংশই ঋণগ্রস্ত। আর যারা ছোট ও প্রান্তিক চাষি তাদের ৫০ শতাংশ ঋণগ্রস্ত।[৫২] খেতমজুরদের ঋণের কথা না হয় বাদ দেওয়া গেল।

এই অবস্থা বছরের পর বছর ধরে চলছে নানা রঙের সরকারের নাকের ডগায়। বরং বলা ভাল, অবস্থা আরও সঙ্গীণ হয়ে উঠেছে দ্রুত তালে। মোদী সরকার চাষিদের জন্য পিএম-কিষাণ নামে একটি প্রকল্প শুরু করে দিবারাত্র তার জয়ঢাক বাজাচ্ছে। যাদের হাতে ২ হেক্টর পর্যন্ত জমি আছে তাদের দেওয়া হচ্ছে মাসে মাত্র ৫০০ টাকা, অর্থাৎ দিনে ১৬ টাকার মতো। তাও সবাই তা পাচ্ছে এমন বলা যাবে না। অথচ সুরেশ তেন্ডুলকর কমিটির যে হিসেব 'নীতি আয়োগ' মেনে চলে, সেই হিসেব অনুযায়ী গ্রামীণ ভারতে প্রতি দিনে দারিদ্র্যসীমা হল মাত্র ৩৩ টাকা।[৫৩] পিএম-কিষাণের প্রদত্ত টাকার দ্বিগুণেরও বেশি। ফলে ৮৬ শতাংশ ছোট ও প্রান্তিক কৃষিজীবী পরিবার থেকে গেছে গভীর সংকটজনক অবস্থায়। ২০১৯ সালে কৃষির সঙ্গে যুক্ত ৪২,৪৮০ জন চাষি বা খেতমজুর আত্মহত্যা করেছে।[৫৪] ১৯৯৫ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে ৩ লক্ষেরও বেশি। একটি হিসেব অনুযায়ী, দেশে প্রতি দিনে গড়ে ২৮ জন কৃষক আত্মহত্যা করে।[৫৫] পঞ্জাব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং কৃষি-বিশেষজ্ঞ সুখপাল সিং পঞ্জাবের অভিজ্ঞতা নিয়ে বলেছেন,

> ছোট কৃষকদের একর-পিছু ঋণের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি এবং ছোট ও প্রান্তিক চাষিরাই সবচেয়ে বেশি আত্মহত্যা করছে। ছোট ও প্রান্তিক চাষিরা তাদের কৃষকত্ব চলে যাওয়া বা জীবিকা চলে যাওয়ার ভয় করছে। হাত থেকে জমি চলে যাওয়ার ভয় করছে।[৫৬]

তাৎপর্যপূর্ণ হল, যারা মধ্য চাষি হিসেবে পরিচিত, অর্থাৎ যাদের হাতে ২ হেক্টরের বেশি জমি আছে (পশ্চিমবাংলায় ১ হেক্টর জমি ৭.৪৭ বিঘার সমান) তারাও গভীর সংকটগ্রস্ত। কেন্দ্রীয় সরকারের কমিশন ফর এগ্রিকালচারাল কস্টস অ্যান্ড প্রাইসেস (সিএসিপি)-এর দেওয়া হিসেব অনুযায়ী গম চাষে চাষিরা কুইন্টাল পিছু মাত্র ৫০০ টাকা আয় করে। অর্থাৎ, প্রতি কেজি গমে ৫ টাকা লাভ।[৫৭] চাষের কাজে সার, বীজ, বিদ্যুৎ, কীটনাশক, আগাছানাশক, যন্ত্রপাতি, মজুরির খরচ, ইত্যাদি ধরলে আয় এরকম দাঁড়ায়। ২০১১ সালের জনসুমারি জানাচ্ছে, প্রতি দিন ২০০০ চাষি চাষ-আবাদ ছেড়ে দিচ্ছে।[৫৮] ২০২১ সালে অবস্থাটা যে আরও খারাপ হয়েছে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ২০১৬ সালে দেশের কৃষকদের গড় বয়স ছিল ৫০.১ বছর।[৫৯] অর্থাৎ নতুন প্রজন্মের চাষ-আবাদে উৎসাহ নেই। লেবার ফোর্স সার্ভে জানাচ্ছে, ২০১৮-১৯ সালে গ্রামীণ পরিবারগুলির চাষের উপর নির্ভরতা ৫০ শতাংশে

নেমে এসেছে। বেঁচে থাকার জন্য তারা এখন অন্য জীবিকা বেছে নেওয়ার চেষ্টা করছে।

১৯৮৩-৮৪ সালে দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে কৃষি ক্ষেত্রের অবদান ছিল ৩৪ শতাংশ। ২০১৮-১৯ সালে তা নেমে এসেছে ১৬ শতাংশে।[৬০] গত দুই দশকে দেশের মোট বিনিয়োগের মাত্র ১০ শতাংশ গেছে কৃষি ক্ষেত্রে।[৬১] রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া জানাচ্ছে, ২০১১-১২ থেকে ২০১৭-১৮ সালের মধ্যে কৃষি ক্ষেত্রে সরকারি খরচ ছিল মোট জাতীয় উৎপাদনের মাত্র ০.৪ শতাংশ![৬২] ১৯৮৩ সালে কৃষির সঙ্গে ৭৭ শতাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিল।[৬৩] এখন সেটা ৫৫ শতাংশ। ৫৫ শতাংশ মানুষ যে জীবিকার সঙ্গে যুক্ত সেখানে জাতীয় উৎপাদনের সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র ব্যয় করে সরকার। তারা কি প্রকৃতই চাষিদের সংকটমুক্ত করতে চায়? বরং, নতুন কৃষি বিলের মাধ্যমে চাষে ভরতুকি তুলে দেওয়া এবং দেশী-বিদেশী কর্পোরেটদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামার কথা বলছে মোদী সরকার। খাদ্যশস্য থেকে বাণিজ্যিক চাষে সরে যেতে বলছে।

তার উপর, সরকার চাষিদের আশ্বাস দিয়ে বলছে, তারা না কি চাষিদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে কৃষি সংস্কার করেছে। আমরা আগে দেখেছি, ২০১৬-১৭ সালে চাষি পরিবারগুলির মাসে আয় ছিল ৮৯৩১ টাকা। পাঁচজনের পরিবার ধরলে প্রতি দিনে মাথাপিছু আয় দাঁড়ায় ৬০ টাকা। অর্থাৎ, মোদী সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আয় দ্বিগুণ হলে প্রতি দিনে মাথাপিছু আয়কে পৌঁছাতে হবে ১২০ টাকায়। ঐ টাকায় দিনে তিনবার খাওয়া খরচ, মাথার উপর আচ্ছাদন, লজ্জা নিবারণে যথাযথ পোশাক, শিক্ষার খরচ, চিকিৎসার খরচ, পরিবহণ খরচ, সামাজিক নিরাপত্তা ও পরিষ্কার পরিবেশ, চাষের ক্রমবর্ধমান বিপুল খরচ, মহাজনের কাছে সুদ-আসল শোধ দেওয়া, ইত্যাদির খরচ কি মেটানো যায়? তার উপর চাষিদের আয় নির্ভর করে সে কতটা ছোট বা প্রান্তিক (বা গরিব) তার উপর। গড়পরতা আয় যদি মাথাপিছু দিনে ১২০ টাকা হয়, ১ হেক্টরের কম জমি আছে এমন চাষিদের যে সেই আয় করার ক্ষমতা নেই তা চোখ বুজে বলে দেওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে, আয় কতটা হবে তা নির্ভর করে চাষিদের জমি কতটা উর্বর, তা নিয়মিত সেচ পায় কি না, প্রাকৃতিক অনিশ্চয়তা, চাষের কাজে উন্নত বিদ্যা বা প্রযুক্তি কাজে লাগানোর সুবিধা আছে কি না এই ধরনের একগাদা শর্তের উপর। তার উপর চাষের খরচ যেভাবে বেড়ে চলেছে, তার ফলে বহু চাষি চাষ-আবাদ ছেড়ে দিচ্ছে তা আমরা আগেই দেখেছি। সরকার যখন আশ্বাস দেয়, তখন কি এগুলো মাথায় রেখে বলে? চাষের খরচ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকার ব্যবস্থা নিচ্ছে এমন কথা তাদের থেকে শোনা গেছে কি? বস্তুত, সরকার এ ব্যাপারে একেবারেই নিশ্চুপ।

আরও বলা হচ্ছে, সরকার চাষিদের মধ্যস্বত্বভোগী বা দালালদের হাত থেকে নিষ্কৃতি দিচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, যতদিন পুঁজিবাদী রাজ থাকবে, ততদিন কৃষিজাত উৎপাদনের ব্যবসা-বাণিজ্যে দালাল-মধ্যস্বত্বভোগী থেকে যাবে। সরকার বরং চাষিদের দালালদের হাত থেকে মুক্তির নামে তাদেরকে তুলে দিচ্ছে আরও বৃহদাকার দালাল ও কর্পোরেট সংস্থার হাতে। সরকার যে চুক্তি চাষে চাষিদের বেঁধে ফেলতে চাইছে তাতে তো কোম্পানিগুলোর দালালদের পোয়াবারো। এছাড়া, ফসল ব্যবসায়ী বড় কোম্পানিগুলো তাদের আধুনিক কালের নায়েব-বরকন্দাজ দিয়ে চাষিদের বুকের উপর পা দিয়ে চাষির হাত থেকে ফসল ছিনিয়ে নেবে সস্তা দরে। ফলে সরকারের কৃষি বিলে বুকের উপর চেপে বসবে আরও বড়সড় দালাল ও কোম্পানি। প্রকৃতপক্ষে, বড় বড় কোম্পানির দাপটে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিরা তো বটেই, এমনকি মধ্য চাষীরা পরিণত হবে কোম্পানির ভাড়া করা মজুরি-দাসে। এমন উদাহরণ অন্যান্য দেশে অনেক পাওয়া যায়।

আগেই দেখেছি, এখন দেশে জমি আছে এমন কৃষকের থেকে জমিহীন খেতমজুরের সংখ্যা বেশি। এদের প্রকৃত মজুরি বাড়ে না। বছর বছর মূল্যবৃদ্ধিকে হিসেবে আনলে তাদের প্রকৃত মজুরি কমছে এমনই এক চিত্র পাওয়া যায়।[৬৪] তার উপর, জমিতে আরও বেশি পরিমাণে মেশিন দিয়ে কাজ করলে এই মজুরদের কাজ জোটে না। আর, জমি

যদি ক্রমশ ধনী চাষি ও কর্পোরেট প্রভুদের পেটে গিয়ে ঢোকে, তবে উন্নত মেশিন কাজে লাগানো হবেই এবং মজুরদের কাজ আরও অনেক বেশি পরিমাণে চলে যাবে। কৃষি বিলের মাধ্যমে চাষ-আবাদে কর্পোরেট আধিপত্যের ফলে সামান্য কিছু নতুন কাজ হয়তো সৃষ্টি হবে—যেমন, খামার-কর্মচারী, অ্যাসিস্টেন্ট, হিসাবরক্ষক, মুটে, চাষিদের থেকে পাওনা আদায়ের জন্য পেয়াদা, বাবুদের ফাইফরমাশ খাটার জন্য কিছু আমআদমির কাজ হয়তো জুটে যাবে। কিন্তু বাকিরা কোথায় যাবে? ওদিকে শহরে কাজ প্রায় নেই। ফলে তারা যে শহরে গিয়ে কাজের খোঁজ করবে সেই রাস্তাও প্রায় খোলা নেই। প্রকৃতপক্ষে, তারা মজুত বেকার বাহিনীর সংখ্যা বাড়াবে। ফলে মজুরি আরও কমতে থাকবে। গরিব মেহনতী মানুষের সংকটজনক অবস্থা গভীরতর হবে।

কৃষিসংস্কারের ফলে অন্যান্য দেশে কী ঘটেছে?

বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও আইএমএফ-এর নির্দেশিত পথে উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলির কৃষি ক্ষেত্র ও খাদ্য বণ্টন ব্যবস্থাকে ভুবনীকরণ, বেসরকারিকরণ এবং উদারীকরণের সঙ্গে বেঁধে ফেলার মাশুল দিতে হয়েছে ঐ দেশগুলির ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং গরিব কৃষকদের। এছাড়া, উন্নত ধনী দেশগুলির সঙ্গে কৃষি চুক্তি এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কড়া আধিপত্যের ফলে বহু দেশের কৃষিক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী ধনী দেশগুলি ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলির কব্জা আরও দৃঢ় হয়ে উঠেছে। ১৯৯৪ সালে মেক্সিকোর সঙ্গে আমেরিকা ও কানাডার ন্যাফটা চুক্তিতে চাষআবাদের উপর কর্পোরেট ও বহুজাতিক কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ কায়েমের ফলে কৃষি ক্ষেত্র ও খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়। যেমন,

১) মেক্সিকোর স্টেট ট্রেডিং কোম্পানি (ভারতের এফসিআই-এর মতো) উঠে গেছে। ২) কৃষিকার্যে সরকারি সাহায্য গুটিয়ে ফেলা হয়েছে। ৩) খাদ্যদ্রব্যের উপর সরকারি ভরতুকি তুলে নেওয়া হয়েছে। ৪) মেক্সিকোর প্রধান খাদ্যশস্য এখন আমেরিকা থেকে আমদানি করা হয়। ৫) মেক্সিকোর পরিবার-কেন্দ্রিক খামারগুলোর অর্ধেক উঠে গেছে। ৬) কৃষিতে মোট কাজের সুযোগ ব্যাপক মাত্রায় সঙ্কুচিত হয়েছে। ফলে বেকারি হয়েছে আকাশছোঁয়া। ৭) বহু মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে গেছে। ৮) মেক্সিকোর অর্ধেক মানুষের হাতে এখন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য পৌঁছায় না। প্রতি পাঁচ জনের একজন খাদ্য পায় না। ৯) বেকার মেক্সিকোবাসী বেঁচে থাকার মরিয়া তাগিদে উত্তর আমেরিকায় পাড়ি দিচ্ছে এবং ঘাড়ধাক্কা খাচ্ছে। ১০) খাদ্যের দাম বহুগুণ বেড়ে গেছে। ১১) মেক্সিকোর দানাশস্য (যা তাদের মূল খাদ্য)-এর বাজার এখন মাত্র দু'টি কোম্পানি নিয়ন্ত্রণ করছে।[৬৫]

মেক্সিকোর শাসকশ্রেণি ন্যাফটা চুক্তির আগে সেখানকার কৃষক ও জনগণের কাছে লাগাতার স্বপ্নের ফিরি করেছিল (যেমন এখন ভারতে করা হচ্ছে)। সেই স্বপ্ন উবে গেছে। শুধু মেক্সিকো নয়, লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়ার বহু দেশের একই অবস্থা। এমনকি, আমেরিকা ও ব্রিটেনের মতো উন্নত দেশের চাষিদেরও অতীতে একই মাশুল দিতে হয়েছে। ভারতের কৃষক আন্দোলনের প্রতি আমেরিকার ৮৭টি কৃষক সংগঠন সমর্থন জানিয়ে যে চিঠি দিয়েছে তাতে তারা উল্লেখ করেছে, চার দশক আগে আমেরিকাতে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও বণ্টনের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ উঠে যায়, ফসলের সংগ্রহমূল্য (আমাদের দেশের ন্যূনতম সহায়ক দামের মতো) তুলে দেওয়া হয়, ভরতুকি ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হয়, চুক্তি চাষ চালু করা হয়। এর ফলে লাভবান হয় ধনী কৃষক ও বড় কর্পোরেট ব্যবসায়ীরা। ক্ষুদ্র চাষিরা, যাদের পূর্বপুরুষ বহুকাল ধরে কৃষিতে নিযুক্ত ছিল, তাদের আয় কমে যায় এবং তারা অন্য জীবিকা বেছে নিতে বাধ্য হয়। সেই সময়ে আমেরিকার কৃষিসচিব কৃষিকে এক বৃহৎ ব্যবসাক্ষেত্র হিসেবে দেখেছিলেন এবং তা থেকে সরকারের হাত তুলে নেওয়ার জন্য জোর সওয়াল করে কৃষকদের উদ্দেশে বলেছিলেন, ''হয় বড় হও, নতুবা চাষবাস ছেড়ে দাও'' (অনেকটা ভারতের চাষিদের আয় দ্বিগুণ করার আহ্বানের

মতো)। ১৯৮২ সালের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকটি শস্য কোম্পানি মার্কিন ভুট্টা ও গমের ৯৫ শতাংশ, ওটস-এর ৯০ শতাংশ এবং জোয়ারের ৮০ শতাংশ ব্যবসাকে দখল করে ফেলে।[৬৬] ১৯৭০ সালের পর আমেরিকার কৃষি ক্ষেত্রে নিযুক্ত চাষি ও মজুরের তিন ভাগের দুই ভাগ কমে যায় এবং পঁচিশ শতাংশ খামার ঝাঁপ বন্ধ করতে বাধ্য হয়। আমেরিকার ২০১৮ সালের কৃষি বিলে ৫ কোটি ডলার বরাদ্দ করা হয়েছে মানসিক রোগের চিকিৎসার জন্য।[৬৭] আমেরিকাতে এখন মোট আত্মহত্যার থেকে গ্রামীণ ক্ষেত্রে আত্মহত্যা ৪৫ শতাংশ বেশি।[৬৮]

আফ্রিকার ঘানা, কেনিয়া, উগান্ডা, রোয়ান্ডা, বেনিন, ইত্যাদি অনুন্নত দেশেও বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও আইএমএফ-এর শর্তাবলীতে চালু করা কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নানান বিধি সেখানকার ক্ষুদ্র কৃষিব্যবস্থাকে প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছে। ১৯৮৩ সালে ঘানায় কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস নীতি গৃহীত হয়। এর ধাক্কায় ঘানার কৃষি ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া হয়, চাষিদের নির্ধারিত ও নিশ্চিত সংগ্রহমূল্য প্রদানের নীতি বাতিল করে দেওয়া হয়, চাষে প্রয়োজনীয় উপাদান, যেমন বীজ, সার, কীটনাশক, যন্ত্রপাতির উপর ভরতুকি ব্যাপক পরিমাণে রদ করা হয়, কম সুদে সরকারি ঋণব্যবস্থা খর্ব করা হয়, আমদানি শুল্ক ব্যাপক পরিমাণে হ্রাস করে বিদেশী খাদ্যদ্রব্যের আমদানি প্রায় অবাধ করে দেওয়া হয়, বিদেশী প্রতিযোগিতার সামনে পড়ে দেশীয় চাল, টমেটো, ভুট্টা, পোলট্রি উৎপাদন মুখ থুবড়ে পড়ে, খাদ্যদ্রব্যের দাম বড় পরিমাণে বেড়ে যায়। বিপুল পরিমাণে মার্কিন চাল ও ভুট্টা প্রবেশ করতে থাকে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে টমেটো ও পোলট্রির আমদানি দেশীয় উৎপাদন ও ক্ষুদ্র চাষিদের প্রায় ধ্বংস করে দেয়।[৬৯] আফ্রিকার মাদাগাস্কার ও দক্ষিণ আমেরিকার উরুগুয়ে ও জামাইকাতে যথাক্রমে চাল ও দুধ আমদানি অবাধ করে দেওয়া হয়। আফ্রিকার বেনিন ও উগান্ডায় চাষিদের খাদ্য উৎপাদন থেকে সরিয়ে রপ্তানির জন্য তুলো উৎপাদনে জোর ফেলা হয়। কেনিয়া, সিয়েরা লিওনে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। এশিয়ার কম্বোডিয়াতে ক্ষুদ্র চাষিরা ব্যাপক পরিমাণে জমি হারায়। সেই জমি কেন্দ্রীভূত হয় মুষ্টিমেয় ফসল ব্যবসায়ীর হাতে... ইত্যাদি।[৭০]

বস্তুত, বিশ্বের উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলির কৃষিব্যবস্থার উদারীকরণ ও তাদের কৃষিপণ্যের বাজার দখল সম্পন্ন করা হয়েছে অনেক আগেই। এতদিন ধরে ভারত এই আগ্রাসন কিছুটা প্রতিহত করতে পেরেছে। এবার সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতের শাসকশ্রেণির সাহায্যে ভারতের কৃষিব্যবস্থাকে পুরোপুরি দখল করার অভিযানে নেমেছে। সাম্প্রতিক কৃষি বিলগুলি সেই লক্ষ্যপূরণে রচিত।

ভারতের শাসকশ্রেণি কী চাইছে?

আমরা আগে দেখেছি, ১৯৯১-এ বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও আইএমএফ-এর শর্তাবলী গিলে ভারতে কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস কর্মসূচী গৃহীত হয়। বিশ্ব ব্যাঙ্ক তখনই ভারতের কৃষি ক্ষেত্রে কী কী ধরনের সংস্কার করা 'উচিত' সে ব্যাপারে ভারতের শাসকশ্রেণিকে এককাঁড়ি নির্দেশ দিয়েছিল। ১৯৯৫ সালে গঠিত হয় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা যারা কৃষিকে তাদের আওতায় নিয়ে আসে এবং ভারতকে কৃষি ক্ষেত্রে ভরতুকি কমাতে বলে, আমদানি শুল্ক হ্রাস করার জন্য চাপাচাপি করতে থাকে। ভারতের শাসকশ্রেণি এই চাপাচাপি বা জোর খাটানোর বিরুদ্ধে কিছুটা হলেও কণ্ঠ তুলেছিল। ভারতবর্ষের কৃষি ক্ষেত্রকে সাম্রাজ্যবাদীদের কব্জা থেকে কিছুটা মুক্ত রাখার জন্য চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেই প্রচেষ্টা ছিল দুর্বল। প্রকৃতপক্ষে, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকার তখন থেকেই সাম্রাজ্যবাদী প্রেসক্রিপশন ধীরে হলেও, ক্রমে ক্রমে হলেও মানতে শুরু করেছিল। কিছুটা দরকষাকষি, কিছুটা আত্মসমর্পণ, ঘটনাক্রম এভাবেই এগোচ্ছিল। তা সে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকার হোক, বা যুক্তফ্রন্ট সরকার হোক, বা হোক সে এনডিএ সরকার —তারা দুই পা এগিয়ে এক পা পিছনোর নীতি নিয়ে চলছিল—কেননা কৃষক সংগ্রামগুলি মাঝেমধ্যে প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ

করছিল। শ্রমিক সহ অন্যান্য মেহনতী জনগণও আজকের মতো চুপচাপ সাম্রাজ্যবাদী ও শাসকশ্রেণির হামলাগুলিকে মেনে নিতে চায়নি।

কিন্তু, নতুন শতকে শাসকশ্রেণি যেভাবে খনিজ সম্পদ লুঠের জন্য আদিবাসী ও চাষিদের উপর আগ্রাসী অভিযান নামিয়ে আনল, সেজ বা তথাকথিত উন্নয়নের ধুয়ো তুলে জমি অধিগ্রহণে নেমে পড়ল, একের পর এক রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা বিলগ্নিকরণ বা বেসরকারিকরণ করল প্রায় বিনা প্রতিরোধে এবং শ্রমিকদের উপর লাগাতার ছাঁটাই ও কাজের বোঝা চাপিয়ে দিল, নিয়মিত শ্রমিকদের স্থানে ব্যাপক পরিমাণে ক্যাজুয়াল-কনট্রাক্ট শ্রমিক নিয়োগের রাস্তা করে দিল এবং শ্রম সংস্কারের জোরালো আওয়াজ তুলল, তাতে এটা দেখা গেল যে শ্রমিক-কৃষক জনগণ মাঝে মধ্যে এখানে ওখানে কিছুটা প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে তুললেও তারা আসলে পিছু হটছিল। শ্রমিক-কৃষক জনগণের উপর সুবিধাবাদী সংসদীয় পার্টিগুলির নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে মাঝে মধ্যে তলাকার জনগণের কণ্ঠস্বর নানা ভাবে ধ্বনিত হলেও তাদের কব্জা খুব একটা শিথিল হয়নি। ফলে এখানে ওখানে গড়ে ওঠা প্রতিরোধগুলিকে তারা সংসদীয় গণ্ডির মধ্যে আটকে রাখতে সক্ষম হল। শ্রমিক ও কৃষকের নিজস্ব সংগ্রামী সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা কখনও সখনও দেখা গেলেও তা ছিল খুবই দুর্বল। ফলে ভারতের শাসকশ্রেণি ও সাম্রাজ্যবাদী হামলা নামছিল প্রায় অনায়াসে। এমনকি তলাকার আন্দোলনের প্রচেষ্টাগুলিকে অঙ্কুরেই দমন করার জন্য কালা কানুন ইউএপিএ জারি করতেও তারা দ্বিধা করেনি।

এরই মধ্যে, সম্ভবত ভোটে জেতার তাগিদে ২০১৩ সালে তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকার ভারতের ৬৭ শতাংশ মানুষের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা বিল এনে জনগণকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করল। কিন্তু তা যে শাসকশ্রেণির পছন্দ ছিল না, কিংবা উদারনীতি নিয়ে চলার ক্ষেত্রে যে গতি শাসকশ্রেণি চাইছিল তা যে তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার দিতে পারছিল না তা স্পষ্ট হয়ে গেল ২০১৪ সালে, যখন ভারতের পুঁজিপতি শ্রেণি এবং গ্রামের ধনী কৃষকদের একটা বড় অংশ সোৎসাহে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারকে ক্ষমতায় বসানোর জন্য সরাসরি ওকালতি শুরু করল। ভারতের বড় পুঁজিপতি শ্রেণি অত্যন্ত প্রকাশ্যে মোদী সরকারের মতো এক জবরদস্ত সরকার চাইল এবং তার জন্য তাদের পেটোয়া সংবাদমাধ্যম মোদী সরকারের পক্ষে প্রচারের ঝড় তুলে দিল। ভারতের শাসকশ্রেণি তখন এটাও লক্ষ্য করেছিল, যে মাঝে মধ্যে এখানে ওখানে শ্রমিক-কৃষক জনগণ কিছু প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ইঙ্গিত দেখালেও তাতে না ছিল জোস, না ছিল ঘুরে দাঁড়ানোর মতো ঝলক। ফলে অত্যন্ত আগ্রাসী ভাবে শাসকশ্রেণি তাদের বকেয়া কাজগুলি শেষ করতে নেমে পড়ল এবং মোদী সরকারের ফ্যাসিবাদী প্রবণতাকেও মেনে নিল, কেননা তারা চাইছিল অর্থনীতিতে, কৃষিতে, শ্রম ক্ষেত্রে সংস্কারের ঝড়।

তাই ২০১৪ সালে মোদী সরকারের খাদ্যব্যবস্থায় সংস্কারের জন্য শান্তাকুমার কমিটি গঠন, জমি অধিগ্রহণ নীতিকে আরও দানবীয় করে তোলার চেষ্টা, কিংবা শ্রমসংস্কারের নীল নকশা রচনা করা, ব্যাঙ্ক ও রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের বেসরকারিকরণ, পরিকাঠামোর উন্নয়নের নামে ভারতের বড় পুঁজিপতিদের বিরাট বরাত দেওয়া, পরিবেশ বিধিকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে শিল্প ও খনি স্থাপনে দেশী ও বিদেশী পুঁজিকে সাদর অভ্যর্থনা জানানো, সাম্রাজ্যবাদী চাপের কাছে পুরোপুরি নতজানু হয়ে সামগ্রিক কৃষি সংস্কারের দিকে এগোনো, একই সঙ্গে ভারতীয় কর্পোরেট ক্ষেত্রকে কৃষি ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য ঢালাও আমন্ত্রণ জানানো—এগুলি কোনও বিস্ময়কর বা ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়। এ ক্ষেত্রে মোদী সরকারের ফ্যাসিবাদী অ্যাজেন্ডা বা কর্মসূচী এবং কর্পোরেট জগতের চাহিদারও মিলন ঘটল কোনও অসুবিধা ছাড়াই। ২০১৪ সালের পর প্রকৃতই ভারতের অর্থনীতি ও রাজনীতিতে এক নয়া মোড় দেখা গেল। শাসকশ্রেণির আশীর্বাদ-পুষ্ট মোদী সরকার কতটা অগ্রাসী তার প্রমাণ দেখা গেল কাশ্মীরের সামান্য অবশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য কেড়ে নেওয়ার মাধ্যমে, এনআরসি এবং সিএএ-র মতো দানবীয় নাগরিকত্ব আইন জনগণের উপর চাপানোর

পরিকল্পনার মাধ্যমে, প্রতিবাদগুলোর উপর নির্বিচারে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন চালানোর মধ্য দিয়ে। তাদের অন্যতম সহায় হয়ে দাঁড়াল ভারতের আইন-আদালত। এক কথায়, সাম্রাজ্যবাদী ও দেশীয় পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থ রক্ষার জন্য, ভারতের শ্রমিক কৃষক সহ তামাম গরিব মেহনতী মানুষের জন্য বরাদ্দ অবশিষ্ট সুবিধাগুলো কেড়ে নেওয়ার জন্য এবং সমাজের নীচুতলার দলিত-পিছড়ে বর্গ, আদিবাসী ও মুসলমানদের উপর হামলা চালানোর ক্ষেত্রে তারা এখন ভয়ঙ্কর আগ্রাসী।

তবে, ২০২০ সালে করোনা অতিমারি জনিত পরিস্থিতি শাসকশ্রেণির হামলাকে তীব্রতর করতে সাহায্য করল। বিশেষত, লকডাউন করে শ্রমিক সহ ব্যাপক গরিব মেহনতী মানুষের জীবিকাহীন সম্বলহীন অসহায় অবস্থার সুযোগ নিল শাসকশ্রেণি চালিত মোদী সরকার। শ্রম আইন গৃহীত হয়ে গেল। ব্যাঙ্ক-বিমা-রেল সহ বিস্তর রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বেসরকারিকরণে সবুজ সঙ্কেত দেওয়া হল। নয়া বিদ্যুৎ বিল ও শিক্ষা বিল গ্রহণ করা হল। তিনটি কৃষি বিল জারি করা হল এই আস্থায় যে গ্রামের কৃষকরা পিছু হটা শ্রমিকদের মতো নির্বিবাদে কৃষি আইন মেনে নেবে। কিন্তু তাদের সেই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে কৃষক ও খেতমজুররা যে ঐতিহাসিক সংগ্রাম গড়ে তুলবে, এমন কোনও হিসেব শাসকশ্রেণির আজ্ঞাবহ মোদী সরকারের ছিল না। এখানে তারা কিছুটা হলেও থমকেছে। কিন্তু এই থমকানোর পালা চলতে থাকবে, না কি শাসকশ্রেণি আরও আক্রমণাত্মক হয়ে উঠবে, না কি কৃষকদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য তারা সাম্প্রদায়িক বিভাজনকে গভীর করে তোলার পথ নেবে তা আগামী দিনে জানা যাবে। তবে, কৃষকরা যে ঐতিহাসিক সংগ্রাম গড়ে তুলেছে তাতে এই আশা করাই যায় যে, শাসকশ্রেণির সমস্ত চক্রান্তকে ব্যর্থ করে ভারতের কৃষি ও খাদ্যব্যবস্থাকে কর্পোরেট ও সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে কৃষক ও খেতমজুরদের মরণপণ সংগ্রামের বার্তা ভারতবর্ষের গ্রামে-গঞ্জে আরও বড় আকারে ছড়িয়ে পড়বে, কৃষক সংগ্রাম দেশ জুড়ে ছড়িয়ে যাবে এবং সংগ্রামের ময়দানে এখনও পর্যন্ত অনুপস্থিত শ্রমিকদেরও তা জাগিয়ে তুলবে। তবে তা নির্ভর করছে শ্রমিক-কৃষক সহ তামাম নিপীড়িত গরিব মেহনতী মানুষ এই সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়ে কতটা সচেতন হতে পারে এবং আগুয়ান হতে পারে, তার উপর।

কৃষকরা যে ঐতিহাসিক লড়াই গড়ে তুলেছে তার বার্তা যদি এই পুস্তিকা যথাযথ ভাবে বহন করতে পারে, তবে আমাদের প্রয়াস সার্থক বলে বিবেচিত হবে।

আপডেট স্টাডি গ্রুপ, জুন ২০২১

সূত্র:

১। https://www.business-standard.com/article/pti-stories/time-for-india-to-think-long-term-during-covid19-crisis-arvind-panagariya-120042100316_1.html; ২১.০৪.২০২০, সংগৃহীত ২৫.০৯.২০২০।

২। https://indianexpress.com/article/opinion/columns/economic-package-agriculture-relief-fund-farmers-nirmala-sitharaman-ashok-gulati-6414759/; ১৮.০৫.২০২০, সংগৃহীত ২৫.০৯.২০২০।

৩। https://www.republicworld.com/india-news/politics/pm-modi-plays-up-historic-reform-in-farm-sector-invites-us-business.html; ২২.০৭.২০২০, সংগৃহীত ২৫.০৯.২০২০।

৪। https://www.timesnownews.com/india/article/imf-pill-for-naysayers-farm-bills-passed-by-indian-government-a-potential-step-forward-says-world-body/707477; ১৫.০১.২০২১, সংগৃহীত ০৯.০৫.২০২১।

৫। https://theprint.in/theprint-interview/new-farm-bills-will-allow-indian-farmers-to-reach-out-to-walmart-amazon-says-us-trade-body/575086/; ২৯.১২.২০২০, সংগৃহীত ৩১.১২.২০২০।

৬। https://www.business-standard.com/article/current-affairs/us-backs-india-s-new-farm-laws-says-it-will-improve-efficiency-of-markets-121020400113_1.html; ০৪.০২.২০২১, সংগৃহীত ০৫.০২.২০২১।

৭। https://rupeindia.wordpress.com/2021/01/05/modis-farm-produce-act-was-authored-thirty-years-ago-in-

washington-d-c/; ০৫.০১.২০২১, সংগৃহীত ০৬.০১.২০২১।
৮। পূর্বোক্ত।
৯। https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1681768; ১৮.১২.২০২০, সংগৃহীত ০৬.০১.২০২১।
১০। https://focusweb.org/wp-content/uploads/2021/02/Interrogating-the-Food-2021.pdf; ফেব্রুয়ারি ২০২১, সংগৃহীত ০৯.০৫.২০২১।
১১। https://www.newsclick.in/Why-Does-the-US-Support-Three-Farm-Laws; ১৩.০২.২০২১, সংগৃহীত ০৯.০৫.২০২১।
১২। সূত্র ১০ দেখুন।
১৩। https://www.counterview.net/2017/03/indias-food-security-law-is-against-wto.html; ২৫.০৩.২০১৭, সংগৃহীত ২৬.০৩.২০১৭।
১৫। https://indianexpress.com/article/india/farm-laws-farmers-protests-7139290/; ০৯.০১.২০২১, সংগৃহীত ১৫.০১.২০২১।
১৬। পূর্বোক্ত।
১৭। ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি, ২৪ আগস্ট, ২০১৯, https://www.epw.in/journal/2019/34/technology-and-society/indias-green-revolution-and-beyond.html; সংগৃহীত ০৯.০৫.২০২১।
১৮। পূর্বোক্ত।
১৯। পূর্বোক্ত।
২০। https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=114860; ০৯.০১.২০২১, সংগৃহীত ১৫.০১.২০২১।
২১। https://www.livemint.com/Opinion/RJbHMlsxLygmfJaTor93EL/FCI-reforms-prescription-to-cure-or-kill.html; ২৭.০১.২০১৫, সংগৃহীত ৩১.০১.২০১৫।
২২। সূত্র ৭ দেখুন।
২৩। https://focusweb.org/publications/india-compromises-its-wto-strategy; জানুয়ারি ২০২১, সংগৃহীত ০৯.০৫.২০২১।
২৪। https://www.newsclick.in/why-small-cultivators-lose-contract-farming-deals; ২৫.০৮.২০২০, সংগৃহীত ০৯.০৫.২০২১।
২৫। https://www.newsclick.in/contract-farming-whose-interest-does-it-serve; ০৬.১১.২০১৭, সংগৃহীত ০৯.০৫.২০২১।
২৬। https://thewire.in/agriculture/the-pandoras-box-of-agri-reform-subsidies-and-tariffs; ২১.১২.২০২০, সংগৃহীত ২১.১২.২০২০।
২৭। https://www.reuters.com/article/usa-trade-india/exclusive-u-s-pushing-india-to-buy-5-6-billion-more-farm-goods-to-seal-trade-deal-sources-idINKBN1ZN1DW; ২৪.০১.২০২০, সংগৃহীত ৩১.১২.২০২০।
২৮। সূত্র ২৬ দেখুন।
২৯। https://www.grain.org/en/article/6472-perils-of-the-us-india-free-trade-agreement-for-indian-farmers; ২৬.০৫.২০২০, সংগৃহীত ৩১.১২.২০২০।
৩০। https://www.ndtv.com/india-news/india-us-negotiating-on-tariff-policies-access-to-farm-products-congressional-report-2350801; ১১.০১.২০২১, সংগৃহীত ১৫.০১.২০২১।
৩১। সূত্র ২৯ দেখুন।
৩২। https://countercurrents.org/2021/02/the-wef-agenda-behind-modi-farm-reform/; ১৭.০২.২০২১, সংগৃহীত ১৭.০২.২০২১।
৩৩। পূর্বোক্ত।
৩৪। পূর্বোক্ত।
৩৫। পূর্বোক্ত।
৩৬।পূর্বোক্ত।
৩৭। https://www.newsclick.in/India-Needs-Stronger-Wider-Public-Procurement-Policy-Feed-Poor; ২৮.১২.২০২০, সংগৃহীত ৩১.১২.২০২০।
৩৮। https://www.weforum.org/agenda/2020/01/fighting-malnutrition-from-the-grassroots-of-india/; ১৮.০১.২০২১, সংগৃহীত ০৫.০২.২০২১।
৩৯। https://www.business-standard.com/article/economy-policy/why-are-indians-still-starving-when-

foodgrain-output-is-at-a-record-high-118081200193_1.html; ১২.০৮.২০১৮, সংগৃহীত ৩১.১২.২০২০।

৪০। https://www.thehindu.com/news/national/76-of-rural-indians-cant-afford-a-nutritious-diet-study/article32881678.ece; ১৭.১০.২০২০, সংগৃহীত ৩১.১২.২০২০।

৪১। https://www.downtoearth.org.in/news/food/india-claims-to-be-self-sufficient-in-food-production-but-facts-say-otherwise-62091; ১৫.১১.২০১৯, সংগৃহীত ৩১.১২.২০২০।

৪২। পূর্বোক্ত।

৪৩। https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/indicators/consumer-spending-declines-for-first-time-in-four-decades/articleshow/72069291.cms?from=mdr; ১৬.১১.২০১৯, সংগৃহীত ৩১.১২.২০২০।

৪৪। https://www.thehindu.com/opinion/lead/more-evidence-of-indias-food-insecurity/article32424037.ece; ২৪.০৮.২০২০, সংগৃহীত ৩১.১২.২০২০।

৪৫। https://www.downtoearth.org.in/blog/food/global-hunger-index-why-is-india-trailing—73920; ২৩.১০.২০২০, সংগৃহীত ৩১.১২.২০২০।

৪৬। https://www.newsclick.in/India-Needs-Stronger-Wider-Public-Procurement-Policy-Feed-Poor; ২৮.১২.২০২০, সংগৃহীত ৩১.১২.২০২০।

৪৭। https://www.newsclick.in/What-Lies-Foundation-Prolonged-Agrarian-Crisis-India; ০৬.০৫.২০২১, সংগৃহীত ০৯.০৫.২০২১।

৪৮। https://thewire.in/agriculture/a-policy-roadmap-to-end-farmers-distress; ২০.০৩.২০১৯, সংগৃহীত ৩১.১২.২০২০।

৪৯। https://www.business-standard.com/article/economy-policy/rs-1-413-avg-monthly-surplus-for-rural-india-is-just-enough-to-buy-a-fan-118092400093_1.html; ২৪.০৯.২০১৮, সংগৃহীত ২৫.০৯.২০২০।

৫০। সূত্র ৪৭ দেখুন।

৫১। https://rupeindia.wordpress.com/2021/02/03/the-kisans-are-right-their-land-is-at-stake-part-2-of-3/; ০৩.০২.২০২১, সংগৃহীত ০৩.০২.২০২১।

৫২। https://www.thehindu.com/news/national/half-of-farm-households-indebted-nabard-study/article24731947.ece; ১৯.০৮.২০১৮, সংগৃহীত ২৫.০৯.২০২০।

৫৩। https://www.thehindu.com/business/Industry/niti-aayog-task-force-backs-tendulkar-poverty-line/article8371390.ece; ১৮.০৩.২০১৬, সংগৃহীত ৩১.১২.২০২০।

৫৪। https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/ncrb-data-shows-42480-farmers-and-daily-wagers-committed-suicide-in-2019/articleshow/77877613.cms; ০১.০৯.২০২০, সংগৃহীত ৩১.১২.২০২০।

৫৫। https://www.outlookindia.com/website/story/opinion-before-india-breaks-its-promises-the-cautionary-tale-of-the-american-kisan/368180; ২৩.১২.২০২০, সংগৃহীত ০৯.০৫.২০২১।

৫৬। https://www.newslaundry.com/2020/12/04/why-landless-and-marginal-farmers-are-the-backbone-of-farmer-protests; ০৪.১২.২০২০, সংগৃহীত ৩১.১২.২০২০।

৫৭। https://www.newsclick.in/modi-govt-continues-smother-farmers-meagre-msps; ৩১.১০.২০১৯, সংগৃহীত ০১.১১.২০১৯।

৫৮। https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/india-s-agrarian-distress-is-farming-a-dying-occupation-73527; ২৪.০৯.২০২০, সংগৃহীত ৩১.১২.২০২০।

৫৯। পূর্বোক্ত।

৬০। https://www.thehindubusinessline.com/opinion/why-agriculture-sectors-share-in-employment-is-declining-in-rural-india/article32900228.ece; ২০.১০.২০২০, সংগৃহীত ৩১.১২.২০২০।

৬১। https://www.downtoearth.org.in/news/food/india-claims-to-be-self-sufficient-in-food-production-but-facts-say-otherwise-62091; ১৯.১১.২০১৮, সংগৃহীত ৩১.১২.২০২০।

৬২। https://indianexpress.com/article/opinion/columns/farmers-crisis-protest-laws-7229913/; ২৪.০৩.২০২১, সংগৃহীত ০৯.০৫.২০২১।

৬৩। সূত্র ৬০ দেখুন।

৬৪। https://indianexpress.com/article/india/real-rural-wages-plunge-3-8-in-september-6162524/; ১২.১২.২০১৯, সংগৃহীত ০৯.০৫.২০২১।

৬৫। https://rupeindia.wordpress.com/2020/12/03/peasant-agitation-against-three-acts-not-their-fight-alone/;

০৩.১২.২০২০, সংগৃহীত ০৪.১২.২০২০।

৬৬। https://www.newsclick.in/Liberalisation-Agriculture-Lessons-Developed-Developing-Countries; ২৮.০২.২০২১, সংগৃহীত ০৯.০৫.২০২১। https://thewire.in/agriculture/farm-bills-small-farmers-and-chasing-the-agri-dollar-dream; ২৫.০৯.২০২০, সংগৃহীত ০৯.০৫.২০২১।

৬৭। https://www.outlookindia.com/website/story/opinion-before-india-breaks-its-promises-the-cautionary-tale-of-the-american-kisan/368180; ২৩.১২.২০২০, সংগৃহীত ০৯.০৫.২০২১।

৬৮। সূত্র ৬৬ দেখুন।

৬৯। https://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=GB2013202596; এপ্রিল ২০০৬, সংগৃহীত ০৯.০৫.২০২১।

৭০। https://www.iatp.org/sites/default/files/Impact_of_Trade_ Liberalisation_on_Food_Securit.htm; সংগৃহীত ০৯.০৫.২০২১।